Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকউল্লাহ খান
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.6
Pages	82-122
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস

রফিকউল্লাহ খান

প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টি, সমাজ-রাজনীতি ও ইতিহাসমনস্ক বিষয়চেতনা বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় সত্যেন সেন (১৯০৭–১৯৮১)-কে বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত করেছে। ব্যক্তি–জীবনের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সাথে তিনি অধীত জ্ঞানের সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টি ও শ্রেণী–সংগ্রামের আবহমান ইতিহাসবোধ তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনাকে করেছে নবমাত্রিক ও স্বতন্ত্র। বিভাগোত্তর উপন্যাসের রোম্যান্স ও রোম্যান্টিকতামুখী ইতিহাস–অন্বেষা তাঁর সৃষ্টিকর্মে বস্তুনিষ্ঠ অনুধ্যানের বিষয়ে পরিণত হয়। বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সংগ্রামের গৌরবময় অতীত ও বর্তমানকে তিনি বিশ্বজনীন চেতনাপ্রবাহের সাথে সমন্বিত করেছেন। ইতিহাসকে বিভিন্ন জাতির লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের লোকজীবন, লোকবিশ্বাস, লোক–ইতিহাস এবং মিথ–পুরাণের বিচিত্র ধারায় সঞ্চারিত করেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস, মিথ্ কিংবা পুরাণ উপকরণ মাত্র; কিন্তু বিষয়ভাবনার মূলে বিদ্যমান মানুষের অস্তিত্বকামী, সংগ্রামশীল জীবনের আদি–অন্তব্যাপ্ত গতিপ্রবাহ।

একটি জাতির সামাজিক–রাজনৈতিক ঘটনাধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েই কোনো সৃষ্টিশীল মানসের বিকাশ ও রূপান্তর ঘটে। এবং শিল্পের প্রত্যয় ও প্রকরণে সূচিত হয় অবস্থানুগ ব্যঞ্জনা। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ও তার পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের শিল্পি মানসকে করেছিলো দ্বন্দ্বজটিল ও দ্বিধারক্তিম। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের রক্তিম উত্তরণে ঔপন্যাসিকের মধ্যে স্বপ্ন ও সম্ভাবনার নবদিগন্ত উন্মোচিত হলেও ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন সেই গতিকে করে বাধাগ্রস্ত। সমকালীন সমাজ ও জীবন থেকে দূরবর্তী পটভূমিকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনায় শিল্প–মনস্তত্ত্ব উল্লিখিত সমাজসত্যের গভীরেই নিহিত।

ইউরোপে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। ওয়াল্টার স্কটের *Waverley* প্রকাশিত হয় ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে। অবশ্য ইতিহাস বা পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে উপন্যাস রচনা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়।[১] বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে সার্থক উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসনের যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বঙ্কিমচন্দ্রকে সামাজিক-ঐতিহাসিক রোম্যান্স রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো, সত্যেন সেনের স্রষ্টাচৈতন্যে সময় ও সমাজচেতনার দিক থেকে সেরূপ কোনো দৃষ্টান্ত ছিলো না। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ভাববাদী জীবনাকাঙ্ক্ষার শিল্প-প্রতিনিধি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যে কারণে, তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের বস্তুসত্য অপেক্ষা ব্যক্তির হৃদয়াবেগের স্বীকৃতিই হয়ে উঠেছে মুখ্য। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের নব্য-ঔপনিবেশিক, দ্বন্দ্বময় ও জটিল সামজকাঠামোতে ইতিহাস বা পুরাণকে রোম্যান্সের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা ছিলো না। এই অগ্রসর সমাজ ও জীবনচৈতন্যের পটভূমিতে পরিণত রাজনৈতিক অভিজ্ঞান থেকে ইতিহাস বা মিথকে বাস্তবতার মাত্রা দান করেন সত্যেন সেন। বিভাগোত্তরকালের 'বিকৃত সমাজ গঠনের চার দেয়ালে শৃংখলিত, সমাজ-শর্তসাপেক্ষ, ব্যক্তি, প্রতিক্রিয়াবাদী চৈতন্যসামগ্রী'ই ছিলো উপন্যাসের মুখ্য উপাদান। যখন 'জলস্তম্ভের মত ঊর্ধ্বগামী কোন প্রতিভা শর্তমুক্ত সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে অবরুদ্ধ অবক্ষয় অচলতাকে চাবুকাঘাত করে সবল করেনি। এমনকি, ইতিহাসের আলোকদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমাজ-অন্তর্গত ক্রমবিকাশের ফল্গুশক্তি স্রোত সন্ধানে ছিল অনীহ',[২] তখন, সত্যেন সেন বিষয় ভাবনা ও জীবনচেতনার দিক থেকে মানব-মুক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করলেন ইতিহাসকে। বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁর উপন্যাস যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি জীবনবোধের বস্তুনিষ্ঠ একাগ্রতায় তা হয়ে উঠেছে সমকালীন জীবন চেতনারই শিল্পপ্রতিভাস। বর্তমানের জীবনচৈতন্যকে ইতিহাসের আশ্রয়ে শব্দময় ও শিল্পময় করার ক্ষেত্রে স্তাঁদাল, স্কট কিংবা বালজাকের যে প্রয়াস,[৩] তারই বিশ শতকীয় প্রতিনিধি সত্যেন সেন। তাঁর ইতিহাস-অন্বেষার গতি-প্রকৃতি ইতিহাস-পুরাণের সেই সকল উৎসকে কেন্দ্র করে কল্লোলিত, যার মধ্যে শিল্পিচৈতন্য মানব-ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ও সংগ্রামশীল ক্রমযাত্রার চিরায়ত স্বরূপ অনুভবে উজ্জ্বল।

সত্যেন সেনের *অভিশপ্ত নগরী* (১৯৬৭) ও *পাপের সন্তান* (১৯৬৯) উপন্যাস খ্রিষ্ট-পূর্ব জেরুজালেম ও ইহুদী জাতির ইতিহাসকে ভিত্তি করে পরিকল্পিত। একাদশ শতাব্দীর অবিস্মরণীয় মুসলিম মনীষী আল বেরুনীর জীবন

ও সংগ্রাম *আল বেরুনী* (১৯৬৯) উপন্যাসের উপজীব্য। *কুমারজীব* (১৯৬৯)তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের কাহিনীর আশ্রয়ে রচিত। বাংলাদেশের শুদ্র জাগরণের পটভূমিতে পরিকল্পিত হয়েছে *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৯৬৯) উপন্যাস। বৈদিক ভারতের অস্তিত্ববিনাশী ধর্মসংস্কার এবং অস্তিত্বকামী মানব–আকাঙ্ক্ষার সুদূর পটভূমির আশ্রয়ে রচিত হয়েছে *পুরুষমেধ* (১৯৬৯) উপন্যাস। *অপরাজেয়* (১৯৭০) উপন্যাসের ঘটনা-উৎস উনিশ শতকের বৃটিশ উপনিবেশ-শৃংখলিত ভারত উপমহাদেশের যুগান্তকারী ঘটনা সিপাহীবিদ্রোহ। বিষয়ের এই বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সত্যেন সেনের ইতিহাস জ্ঞানের সমৃদ্ধিকে প্রমাণ করে, অন্যদিকে তেমনি উন্মোচন করে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রসারতা ও বৈচিত্র্য। কোনো কোনো উপন্যাসে ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্রের সাথে কল্পিত কাহিনীর বিস্তার তাঁর ইতিহাস নিষ্ঠাকে ক্ষুণ্ন করেছে সত্য, কিন্তু জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত মমত্ববোধ এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সঞ্চার করেছে আবহমান সংগ্রামী জীবনচৈতন্য। 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও তারই ধারায় বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রাম তথা গণ–অভ্যুদয় বাংলার লেখক লেখিকাদের কাছে এমন ধরনের লেখার তাগিদ ও প্রত্যাশা উপস্থাপিত করেছে, যা শুধু নতুন ও নতুনতর সমসাময়িক বিষয়বস্তুতে নয়, রচনাশৈলীতেও একটা হেরফের নিয়ে এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশের লেখক-লেখিকারা এই উভয়বিধ দাবী পূরণ করেছেন। এই সত্যেই দেখা দিয়েছে সাধারণভাবে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যিক অথবা সমকালীন বিভিন্ন শৈলীর যে ধারা ভাষা আন্দোলনের পরে আরো সমৃদ্ধ করায় চেষ্টা হয়েছে, তার পাশাপাশি একশ' বছর আগেকার ধ্রুপদী ধারা নতুন ভাবে পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়েছে।...বাংলাদেশে কোটি কোটি শ্রমজীবী তথা কৃষিজীবীদের নব বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক জাতীয় অভ্যুদয় এবং তাঁর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের প্রগাঢ় একাত্মতার যে প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল ধারায় ঘটেছে তাতে প্রাথমিক অগ্রাধিকার পেয়েছে ধ্রুপদী রীতি।'[৪] সত্যেন সেনের মিথ-ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসসমূহ ধ্রুপদী রীতির এই নব-ধারার শিল্পরূপ।

দুই

সত্যেন সেনের *অভিশপ্ত নগরী* ও *পাপের সন্তান* উপন্যাসে ওল্ড টেস্টামেন্টের 'বুক অব দা প্রফেট : যেরেমিয়া খণ্ড' উপাদান উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বিষয়ভাবনার নতুনত্বে এই মিথিক উপাদন উন্নীত হয়েছে মানুষের সংগ্রামী জীবনকাঙ্ক্ষার চিরায়ত শিল্পবৈশিষ্ট্যে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন নির্যাতন, রাষ্ট্রীয়

প্রশাসনে পুরোহিত শ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্য, ধর্মোন্মাদনা, জাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতিকে মানবীয় সঙ্কটের সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন তিনি। খ্রিষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যে হিব্রু মিথলোকের বিচিত্র উপাদান সংরক্ষিত রয়েছে। তার খণ্ডাংশকে সত্যেন সেন নিপুণ কৌশলে প্রয়োগ করেছেন *অভিশপ্ত নগরী* উপন্যাসে। জেরুজালেমের পতন কাহিনীর সমান্তরালে তিনি সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, রাষ্ট্রের ওপর ধর্মের নিয়ন্ত্রণ, মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতির ভয়াবহ পরিণামের সঙ্কেতসূত্র নির্দেশ করেছেন। বাইবেলিক উপাদান ঔপন্যাসিকের কাছে কেবল ধর্মকথা কিংবা মিথ হিসেবেই গৃহীত হয়নি, মানুষের অস্তিত্বসাধনার চিরবাস্তব অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস অপেক্ষা মিথের অনিঃশেষ শিল্পশক্তির ভূমিকাই এ-ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের আরাধ্য।[৫] 'জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে "অভিশপ্ত নগরী" উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু এর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে রয়েছে ইহুদী জাতির পতনের সময়কালীন তার সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, রাজতন্ত্র এবং সর্বোপরি রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে বিরোধের নিগূঢ় ভাষ্য।'[৬] একটি জাতির উত্থান-পতনের সাথে জেরুজালেম নগরীর উত্থান-পতনকে সমন্বিত করে সত্যেন সেন সভ্যতা-বিকাশের এক দ্বান্দ্বিক সত্যস্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

অভিশপ্ত নগরী উপন্যাসবিধৃত চরিত্রসমূহের মধ্যে নবী যেরেমিয়া ও বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের ঐতিহাসিক সময়কালই কেবল ইতিহাসে লভ্য। নবী যেরেমিয়ার ঐতিহাসিক কাল খ্রিস্ট-পূর্ব ৬২৬-৫৮৬। আর নেবুকাডনাজারের হাতে জেরুশালেমের পতন ঘটে খ্রিস্ট-পূর্ব ৫৮৬ সালে। ইতিহাসের এই ক্ষীণ সূত্রের মধ্যে সত্যেন সেনের ঔপন্যাসিক প্রতিভা মানবসভ্যতা , তার বিবর্তন, রাজনীতি, সংগ্রাম ও উজ্জীবনের যে শব্দরূপ নির্মাণ করেছে, তা বিস্ময়কর। এ-উপন্যাসের নায়ককল্প পুরুষ যেরেমিয়া সমষ্টি-অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষার রূপকার। তাঁর মধ্য দিয়েই প্রতিধ্বনিত হয়েছে শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন ও দাসত্বের বিরুদ্ধে মানবীয় প্রতিবাদ। যেরেমিয়ার ভবিষ্যদ্বানী এক গণ-বিচ্ছিন্ন, আভ্যন্তর-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রাষ্ট্রশক্তির অনিবার্য পতনের ইঙ্গিতে হয়ে উঠেছে তাৎপর্যবহ। একজন মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী শিল্পির চৈতন্যে অলৌকিক পুরুষ চরিত্রের স্বীকৃতির পেছনে মিথভাবনার আধুনিকায়নের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় এ-জাতীয় অসংখ্য প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত পুরুষের উপস্থিতি দেখা যায়, যাঁরা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর নায়কপুরুষে পরিণত হয়েছেন।[৭] এই শৈল্পিক অর্থেই সত্যেন সেন যেরেমিয়া

চরিত্রকে স্থাপন করেছেন উপন্যাসকাহিনীর কেন্দ্রভাগে। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের যুগে, এবং তারও আগে, এমনকি বর্তমান ঐতিহাসিক যুগেও–লোকসমাজের সাহিত্য তথা প্রকৃত গণসাহিত্যে যিনি জনগণের মুখপাত্ররূপে আবির্ভূত হন, তাঁর কতকগুলো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য থাকে। দুকূলপ্লাবী আবেগ আর ভয়ংকর ক্রোধ ও ঘৃণা থাকে তাঁর, এই আবেগ জনগণের কল্যাণ অভীপ্সা ও মুক্তিপিপাসার ধারক, ক্রোধ ও ঘৃণা জনগণের শত্রুদের বিরুদ্ধে, জনগণের ইচ্ছাপূরণমূলক ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে আবির্ভূত হন বলেই তিনি জনগণের মুখপাত্ররূপে বরিত হন।'[৮] যেরেমিয়ার মধ্যে ঔপন্যাসিক মিথিক শক্তির এই ইতিবাচক তাৎপর্যকেই সন্ধান করেছেন।

অভিশপ্ত নগরী উপন্যাসের সূচনা নাটকীয় আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের নায়ককল্প পুরুষ যেরেমিয়ার উদ্দেশে উচ্চারিত যেরুশালেমের লোকপ্রধান অহিকমের সংলাপ এবং ক্রোধোন্মত্ত যেরেমিয়ার অগ্নিগর্ভ বাণী কেবল ঐশীবাণীর প্রবক্তা যেরেমিয়ার বর্তমান সক্রিয়তাকেই নির্দেশ করেনি; তাঁর এবং যেরুশালেমের জনগোষ্ঠীর মর্মন্তুদ পরিণামের ইঙ্গিতে হয়ে উঠেছে সংকেতময়, গূঢ়সঞ্চারী :

> : যেরেমিয়া, যেরেমিয়া, আ ঃ তুমি কি বিষাক্ত সাপের মত তোমার ওই তীক্ষ্ণ জিহবাটাকে একটু বন্ধ রাখতে পার না? তোমার ওই তীব্র ফুৎকারে যে–আগুন তুমি জ্বালিয়ে তুলছ, সে আগুন আর কারু গায়ে লাগবে না, সে আগুনে তোমাকে নিজেকেই জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।
>
> : আ ঃ ব্যভিচারের সন্তান, বিষ্ঠাভোজী শূকরশিশু, আর কতদিন তোমার পরমায়ু? যিহোবায় ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মধ্য থেকে তাঁর বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তুমি বধির, তুমি শুনেও শুনতে পাওনা। ওই শোন, দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে প্রভু গর্জন করে উঠেছেন, সিংহের মতই গর্জন করে উঠেছেন–"না না না, আমার ক্ষমার পাত্র নিঃশেষিত হয়েছে, আমি আর ধৈর্য মানব না। আমি আর সহ্য করব না। আমি আমার করুণার দ্বারে অর্গল দিয়ে দিয়েছি। পাপ, পাপ, পাপ! পাপের পাহাড় জমে উঠেছে। আমি তাকে চূর্ণ করব, ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। সে আঘাতে পর্বত কেঁপে উঠবে, মাটি বিদীর্ণ হয়ে ধূম উদ্‌গিরণ করবে, সমুদ্রের তরঙ্গ লাফিয়ে উঠে আকাশ স্পর্শ করবে, আর পাপের নগরী যিরুশালেম প্রসববেদনায় ধরালুণ্ঠিত রমণীর মত তীব্র আর্তনাদ করে উঠবে।'[৯]

এই ক্লাসিক গুণমণ্ডিত অর্য্যাকল্‌ধর্মী গদ্যরীতি উপন্যাসবিধৃত জীবনসত্যের অনুষঙ্গী। আত্মকলহলিপ্ত, ধর্মীয় দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত এবং নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত হতভাগ্য ইহুদী জাতি যখন চূড়ান্ত সর্বনাশের পথে ধাবমান, সেই দুর্যোগময় সময়ে যেরেমিয়া যিহোবার প্রত্যাদেশ প্রচার করে চলেছেন জনগণের মধ্যে। দৈববাণীর অমোঘতা বিনষ্ট রাজতন্ত্র, দাসতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের ধারক–বাহকরা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ঐশীবাণীর প্রচারক যেরেমিয়াকে

তারা প্রতিপক্ষশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পাপাচার-অনাচারলিপ্ত যেরুশালেমবাসীদের তিনি বলেন, 'পাপের সন্তান', আর যেরুশালেম নগরী 'অভিশপ্ত নগরী।' যেরেমিয়া উচ্চারিত শব্দপ্রবাহ 'শুধু বাণী নয়, এ যেন এক সংগীত-তরঙ্গ উঠছে, নামছে, দুলছে, ফুলছে, আর তীব্র আবেগে ভেঙ্গে শতধা বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে।' এবং তার 'কিছু বোঝা যায়, কিছু বা দুর্বোধ্য। শুনলে রোমাঞ্চ জাগে আতঙ্কে, তবু অজগরের উজ্জ্বল চোখের মত তীব্র তার আকর্ষণ। ঘরের মানুষকে পথে আনিয়ে দাঁড় করিয়ে ছাড়ে।' মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, দুর্ধর্ষ ক্যালদীয়েরা যেরুশালেমের এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের সুযোগে নির্বিঘ্নে ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হবে। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশকল্প বাণীর মধ্যে যে মর্মান্তিক পরিণামের ইঙ্গিত বর্তমান-তার মূলে রয়েছে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা-অন্ধ অস্থিরচিত্ততা এবং মন্দিরের পুরোহিতবর্গের সীমাহীন স্বেচ্ছাচার। কিন্তু ধর্মান্ধ, ক্ষমতালিপ্সু পুরোহিতবর্গ এবং পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত রাজন্যবর্গ নিজেদের পরিণাম অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। তারা ঈশ্বরের বাণীবাহক যেরেমিয়ার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। যেরেমিয়ার বন্ধু লোকপ্রধান অহিকমের উচ্চারণে ঘটনা, তার পটভূমি ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে ·

> : তুমি কিছুই করনি যেরেমিয়া, শুধু রাজাকে তাঁর কলঙ্কিত সিংহাসন থেকে আর আচার্যকে তাঁর ধর্মাসন থেকে টেনে নামাবার আহবান জানিয়েছ। তুমি গর্বোন্মত্ত অত্যাচারীদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছ, পরস্বভোজীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছ। তুমি যিরুশালেমকে অভিশপ্ত নগরী বলে ঘোষণা করনি? তুমি কি প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে একথা বলনি— যিরুশালেমের প্রাচীর ধ্বসে পড়বে, প্রভুর মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, আর বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের ক্যালদীয় সৈন্যদের দ্বারা যিরুশালেম ও য়াহুদা লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা হবে? ...ওরা তোমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও দেশদ্রোহী বলে অভিযোগ এনেছে।...ওরা তোমার মৃত্যুদণ্ডের দাবী করেছে। [প্রথম পরিচ্ছেদ]

প্রাথমিকভাবে আত্মগোপন করে রক্ষা পেলেও যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় রাজা যিহোয়াকীম ও 'মন্দিরের অধ্যক্ষ আচার্য পশহুর'। 'জীর্ণ বস্ত্র, নিঃসম্বল পথাশ্রয়ী নবী যেরেমিয়া রাজপ্রাসাদ ও মন্দির উভয়কেই চিন্তাকুল করে তুলেছেন।' (পরিচ্ছেদ।। দুই)। মন্দির আর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও যেরেমিয়ার ব্যাপারে তাদের মনোভাব অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত। যেরেমিয়ার আত্মগোপন প্রকৃতপক্ষে লোকপ্রধান অহিকমের আয়োজন। কিন্তু নির্ভীক সংগ্রামী যেরেমিয়া এই কাপুরুষতার বিরুদ্ধে হয়ে ওঠেন দ্রোহী। জনগণের মধ্যে যেরেমিয়ার প্রভাব ছিলো সীমাহীন। রাজা-পুরোহিতের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। অহিকমের উদ্দেশ্যে তাদের উচ্চারণ : 'আপনারা

লোকপ্রধান, আপনাদের প্রধান বলে আমরা মান্য করি। কিন্তু যিরুশালেমের এই দুর্দিনে আপনারা এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? এত রক্তপান করেও রাজাদের তৃপ্তি হয়নি? এবার যিহোবার নিজের মানুষ যেরেমিয়াকে হত্যার চক্রান্ত চলছে। নবী যেরেমিয়া যদি সত্য সত্যই ধরা পড়েন, আর তাঁর বিচার হয়, তাহলে আপনারা লোক প্রধানেরা তখন তাঁর পক্ষে থাকবেন কিনা, আপনাদের মুখ থেকে একথা আজ আমরা স্পষ্ট করে শুনে নিতে চাই।' (পরিচ্ছেদ ।।পাঁচ)। উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে যেরেমিয়ার বিচারকার্য। বিচার চলাকালে বিচারসভার বাইরে অজস্র জনতা যেরেমিয়ার মুক্তি দাবী করে। অধ্যক্ষগণ যেরেমিয়ার মুক্তিদানকে সঙ্গত বলে ঘোষণা করে'। কিন্তু এই ঘটনায় আনন্দমুখর জনতার উল্লাসধ্বনি আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা শোনা যায় ঘোষণাকারীদের সন্ত্রস্ত কণ্ঠ : 'দ্বার বন্ধ কর, দ্বার বন্ধ কর, নগরীর দ্বার বন্ধ কর। য়াহুদা আক্রান্ত, যিরুশালেম আক্রান্ত, বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের সৈন্যগণ য়াহুদার সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে এসে প্রবেশ করেছে। ওরা ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। নাগরিকগণ, শান্তিপূর্ণভাবে যে যার ঘরে ফিরে যাও। প্রাচীর-প্রহরিগণ নিজ নিজ স্থানে মোতায়েন থাকো। দ্বার বন্ধ কর, দ্বার বন্ধ কর, নগরীর দ্বার বন্ধ কর।' (পরিচ্ছেদ ।। ছয়)। সপ্তম পরিচ্ছেদে অবরুদ্ধ যেরুশালেমর অন্তর – বাহিরের বিচিত্ররূপ উন্মোচিত হয়েছে। সশস্ত্র মৃত্যু, রক্তাক্ত, 'উদ্যত থাবার কালো ছায়ার নীচে' অবরুদ্ধ নগরীর নিষ্ক্রিয় মানুষেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল কথকের গল্প শোনে। আর ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ যেরেমিয়া প্রচার করেন সর্ববিনাশের ইঙ্গিতবাহী প্রভুর অলঙ্ঘ্য বিধান। পুরোহিতের নিষেধ সত্ত্বেও রাজা এবং লেখক যোনাথন গোপনে ছদ্মবেশে মন্দিরে গমন করেন। এবং মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ক্লেদ-পঙ্কিলতাপূর্ণ বীভৎসতা দর্শনে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হন। নবম পরিচ্ছেদে ধর্মের ঘৃণ্য অন্তঃস্বরূপ অঙ্কনে ঔপন্যাসিকের কল্পনার সমৃদ্ধি বিস্ময়কর। 'এর পরের ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেল। সেদিন সন্ধ্যার সময় রাজা যিহোয়াকীম মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন, তার পরদিনই নিশীথ রাত্রিতে ক্যালদীয়েরা নগরে প্রবেশ করল। কেউ বলল, ওরা প্রহরীদের অসতর্কতার সুযোগে প্রাচীর টপকে ঢুকে পড়েছিল। আবার কেউ বলল, ভেতর থেকে দরজা খুলে ওদের ডেকে আনা হয়েছে। একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করল ক্যালদীয়েরা যা যা করবার স্বচ্ছন্দে করে গেল, বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ তারা পায়নি।' (পরিচ্ছেদ ।।দশ)। ক্যালদীয়েরা রাজা যিহোয়াকীমকে বন্ধী করে নিয়ে গেল বাবিলে এবং তার পুত্র 'যিহোইয়াকিনকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হল, বাবিলরাজ নেবুকাডনাজাদের আদেশে। তরুণ রাজার সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও তার রাজত্বের সপ্তমবর্ষে পুনরায় আক্রান্ত হয় যেরুশালেম।

যুগযুগসঞ্চিত বিপুল সম্পদ ভারবাহী বন্দীদের মাধ্যমে চালান করা হলো বাবিলে:

> শুধু কি তাই? রাজা যিহোইয়াকীন, তাঁর মা বেহুশতা, তাঁর পত্নীগণ, কুলপতিগণ আর নগরের যোদ্ধাগণকে বন্দী করে বাবিলে পাঠানো হোল। রজ্জুবদ্ধ পশুর মত হাজার হাজার বন্দী পায়ের শিকল টানতে টানতে তাদের পেছনে পেছনে চলল। তাদের মধ্যে ছিল অস্ত্রধারণক্ষম সাত হাজার পুরুষ আর এক হাজার কারিগর ও কর্মকার।
>
> অভিজাত পরিবারের বাছা বাছা সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল ওরা। যে-মেয়েরা কখনও পায়ে হেঁটে পথ চলেনি, তাদের অনাবৃত সুকোমল মুখমণ্ডল প্রখর সূর্যের তাপে ফুলের মতই শুকিয়ে উঠল। ভয়ার্ত হরিণীর মতই ওরা কাঁপছিল আর ব্যাকুল চোখে চারদিকে চাইছিল (পরিচ্ছেদ: এগারো)।

বর্হিশক্তির শাসন-শোষণ-নিপীড়নে বিপর্যস্ত জনজীবনে আত্মশক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বৃদ্ধি পায়। দুর্বহ করের বোঝা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে ওঠে। মন্দির কর্তৃপক্ষ ও মন্দিরের অধ্যক্ষবৃন্দের প্ররোচনায় রাজা যেদেকিয়া মিসর-রাজের কাছে দূত প্রেরণ করেন। 'সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। একদিকে বাবিল আর একদিকে মিসর, মাঝখানে তাদের হাতের ক্রীড়নক হতভাগ্য ইহুদী জাতি।' আত্মশক্তিহীন ধর্মশক্তি-রাজশক্তিকর্তৃক পরজাতিকে আমন্ত্রণ জানানোর এই আত্মবিনাশী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় উচ্চারিত হয় যেরেমিয়ার সতর্কবাণী, ঈশ্বরাদেশ : 'বরঞ্চ বিষাক্ত সাপকে বিশ্বাস কর, কিন্তু ফেরাউনকে বিশ্বাস কোরো না। অত্যাচারী ফেরাউনের বজ্র বাঁধন থেকেই একদিন আমি তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মুক্ত করে এনেছিলাম, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে সে কথা কি তোমরা পড়নি।' যেরুশালেমের মধ্যে এভাবেই চলতে থাকে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব। যিহোবারও যেন দ্বিধাবিভক্তি ঘটে, মন্দিরের যিহোবা মিশরের দিকে, তার যেরেমিয়ার যিহোবা বাবিলের দিকে।' বাবিলে নির্বাসিত ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্রোহের আশঙ্কা হয়ে ওঠে প্রবল। যেরেমিয়া তাদেরকে জানালেন ঈশ্বর প্রদত্ত বাণীর বার্তা, যার অর্থ নির্বাসিত অবস্থায় জীবনযাপন এবং বংশবৃদ্ধি। কেননা, 'সংখ্যাই শক্তি, সংখ্যার বৃদ্ধিতেই জাতির বৃদ্ধি।' স্বদেশ-প্রত্যাগমন-ইচ্ছুক অধিকাংশ ইহুদীর কাছেই যেরেমিয়ার বাণী গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

যেরুশালেমের এই বিপর্যস্ত, বিপন্ন অবস্থায় দাস-বিদ্রোহের সম্ভাবনায় আলোড়িত হলো সমগ্র জনগোষ্ঠী। সীদনের বণিকেরা মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এথেন্সের ক্রীতদাসদের কাহিনী প্রচার করলেন যেরুশালেমে। তাঁরা যে বীজ রোপণ করলেন তার প্রতিক্রিয়া হলো দীর্ঘস্থায়ী। প্রথার শৃংখল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইল 'নিরীহ ও বশংবদ প্রাণী' দাস-দাসীরা। লোক প্রধান অহিকমও এর

ফলে চিন্তিত হয়ে পড়লো। দীর্ঘকালের মালিকবৃত্তির সাথে তার মানবকল্যাণকামী সত্তার দ্বন্দ্ব হলো প্রবলতর। তেরো পরিচ্ছেদে যেরুশালেমের রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, নগরবাসীদের মিসরপন্থী ও বাবিলপন্থীতে বিভক্তি, রাজা যেদেকিয়ার দুর্বলতার সুযোগে মন্দিরের অধ্যক্ষ আচার্য পশহুর কর্তৃক মিসরের সাথে যোগাযোগ; ভণ্ড নবী হানানিয়ার উদ্ভব প্রভৃতি ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। যেরেমিয়ার প্রতিপক্ষ হিসেবে হানানিয়াকে নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠাদানের পেছনে পশহুরের ভূমিকাই ছিলো মুখ্য। যার মধ্য দিয়ে যেরুশালেমের দ্বন্দ্বময় ধর্ম-রাজনীতি হলো জটিলতর। শোষক শ্রেণীর চিরায়ত বৈশিষ্ট্যের অংশ হিসেবেই এখানে হানানিয়ার উদ্ভব — যে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হবে, মন্দিরের সংকীর্ণ স্বার্থের অনুকূলে কাজ করবে। অন্যদিকে যেরেমিয়া ঈশ্বরের বাণীর সেই ধারাবাহিকতাই রক্ষা করেছেন : 'যেরেমিয়ার হাতে ছিল একটা কাঠের যোয়াল। এই যোয়ালটি উর্ধ্বে তুলে ধরে তিনি বললেন, এই যোয়াল বাবিলের যোয়াল। স্বয়ং প্রভুর নির্দেশে এই যোয়াল তোমাদের কাঁধের উপর চেপে বসেছে। যতদিন প্রভু তাঁর নিজের হাতে এই যোয়াল ভেঙ্গে না দেন, ততদিন একেই তোমাদের বহন করে চলতে হবে।' (পরিচ্ছেদ ।। তেরো)। চৌদ্দ-পনেরো পরিচ্ছেদে দাসবিদ্রোহের প্রবল রূপ ধারণ করে, যার নেতৃত্ব দেয় অহিকমপুত্র গেদালিয়া। মন্দির পুরোহিত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। এই বিদ্রোহের নেপথ্যে যেরেমিয়া-অহিকমের ভূমিকা প্রচার করে রাজাকে বাধ্য করে তাঁদের বন্দী করতে। শত শত দাস-দাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠায় এ-পর্যায়ে তাঁরা মুক্তিও লাভ করেন (ষোল পরিচ্ছেদ)। কিন্তু দাসবিদ্রোহের ধারাবাহিকতা থাকে অব্যাহত (সতেরো পরিচ্ছেদ)। ক্রীতদাসী সারার সাথে গেদালিয়ার প্রেমকে এ-পর্যায়ে নব-তাৎপর্যে উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক। চন্দ্রালোকিত রাতে দেবতার হিংস্র, ক্রুর, বিকৃত মুখমণ্ডলের সমান্তরালে আলিঙ্গানাবদ্ধ গেদালিয়া-সারার প্রতিস্থাপন গূঢ়সঞ্চারী, সংকেতময়। কেননা, পরবর্তী পরিচ্ছেদেই ক্যালদীয়দের প্রত্যাগমন এবং পুনরাগমন, জনজীবনের অস্থিরতা, সারার মৃত্যু, অহিকমের মৃত্যু এবং যেরেমিয়ার পুনরায় বন্দী হওয়ার মধ্য দিয়ে দেবতার প্রতীকী উপস্থাপনের তাৎপর্য স্পষ্টতা লাভ করে। সারা-গেদালিয়ার প্রেমময় মিলনদৃশ্য এ-উপন্যাসের অন্যতম উজ্জ্বল অংশ :

: এই যে গেদালিয়া, এই-যে আমি। তুমি আমাকে দেখবে? দেখ। আমি তোমার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিলাম।

: সারা, এই দেবতা সাক্ষী থাকুন, আর আকাশে সাক্ষী থাকুক চাঁদ, আজ আমাদের মিলনলগ্ন; সারা, আজ আমাদের মধু-রজনী।

এমন সময় হু হু করে একটা দমকা বাতাস গাছের শাখাগুলো দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেই

দোলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার ফালিগুলো এদিক থেকে ওদিকে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল। সারার মুখের উপর থেকে জ্যোৎস্না সরে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একফালি জ্যোৎস্না দেবতার মুখের উপর এসে পড়ল। এতক্ষণ অন্ধকারে দেবতার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। এবার চাঁদের আলো পড়ে তাঁর বীভৎসতা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল। হিংস্র, ক্রুর সেই বিকৃত মুখমণ্ডল কোন্ বর্বর শিল্পীর কল্পনার সৃষ্টি কে জানে? মুখের দু'পাশ দিয়ে দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে। ঠোঁটের দু'ধার দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চোখ মুখ থেকে কি কুৎসিত একটা হাসি ফুটে বেরোচ্ছে।! সে হাসি দেখলে আতঙ্ক জাগে।

দুজনেই ভীষণ চমকে উঠল।

(পরিচ্ছেদ।।সতেরো)

আকস্মিকভাবে ক্যালদীয়রা 'তাঁবু গুটিয়ে উধাও হয়ে' গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই তারা নবশক্তি বলে পুনরায় যেরুশালেম অবরোধ করে। এই অন্তবর্তী সময়ে যেরেমিয়া নির্মমভাবে বন্দী ও নিগৃহীত হন, লোকপ্রধান অহিকমকে হত্যা করা হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জাগ্রত দাসদের সাথে করা হয় জান্তব আচরণ। উনিশ পরিচ্ছেদ যেরেমিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিশ্লেষণের নিপুণ শিল্পরূপ। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর নগরবাসীরাই একসময় নগরীর দ্বার খুলে দেয়। মুক্তিলাভ করলেন যেরেমিয়া। কিন্তু এই মুক্তি বন্দীত্বের চাইতেও ভয়াবহ :

কিছু দূর গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন যেরেমিয়া। আর তিনি এগোতে পারেন না। পথের এধারে, ওধারে সামনে রাশি রাশি মৃতদেহ পড়ে আছে। আর মাংসভুক শকুনিগুলো তাদের নিয়ে টানাটানি, ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। দুর্গন্ধে বাতাস ছেয়ে গেছে। হায় যিহোবা, এ তুমি কি দেখালে? যেরেমিয়ার মাথাটা কেমন করে উঠল। পা চলতে লাগল। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল, তিনি কাঁপতে কাঁপতে দুই হাতে মাটি ধরে বসে পড়লেন।

—নবী, তোমার ভবিষৎদ্বানী এতদিনে পূর্ণ হয়েছে।

(পরিচ্ছেদ।। কুড়ি)

এভাবেই সাধিত হলো যেরুশালেম নগরীর চূড়ান্ত বিপর্যয়। 'রাজা যেদেকিয়ার রাজত্বের একাদশ বর্ষের চতুর্থ মাসের নবম দিবসে প্রভুর নগরী যিরুশালেমের পতন ঘটল।' (পরিচ্ছেদ ।। একুশ)। সপরিবারে বন্দী হলেন রাজা যেদেকিয়া। বাবিলে নিয়ে নির্মমভাবে তাদের সবাইকে হত্যা করা হলো। প্রায় জনশূন্য হয়ে গেলে অভিশপ্ত নগরী যেরুশালেম। সুন্দরী নগরী বর্বরের নখরাঘাতে হলো ক্ষতবিক্ষত। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বাবিলের স্বার্থের অনুকূলে হওয়ায় তারা যেরেমিয়াকে মিত্র আখ্যায়িত করে অভিনন্দন জানায়। এ–পরিস্থিতিতে যেরেমিয়া চরিত্রের যে–অন্তঃস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে, তা ঈশ্বর ও মানবপ্রেমের উজ্জ্বলতায় বিশিষ্ট। তিনি বলেন, 'বাবিল সেনাপতি, আমি যিহোবার সেবক। আমি যা কিছু

করেছি, যিহোবার নির্দেশ মতই করেছি। বাবিলের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আমার কোনদিনই ছিল না।' (পরিচ্ছেদ ।। বাইশ)। তাঁর দেশানুরাগ ও নির্ভীক উচ্চারণে মূর্ত হয়ে ওঠে নায়কোচিত বিশালতা ও সর্বজনীন জীবনচেতনা :

: বাবিল সেনাপতি, আপনাদের নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীর সমস্ত জাতি বিস্ময় ও আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে আপনাদের এই বিভীষিকাময়ী রক্তাক্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। আপনারা যিরুশালেমের বুকের মণি আমাদের প্রভুর মন্দিরকে ভাস্মসাৎ করেছেন, তার প্রাচীরকে ধ্বংস করে দিয়ে নগরীকে শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছেন, নির্দোষ ও অসহায় নাগরিকদের হত্যা করে আপনাদের রক্ত পিপাসা চরিতার্থ করেছেন, আর যারা বেঁচে আছে সেই হতভাগ্যদের তাদের মাতৃভূমির বুক থেকে উচ্ছন্ন করে পশুর মত দলে দলে বেঁধে নিয়ে গিয়েছেন। আর আপনাদের মহামহিম বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার নিজের দর্শন সুখের জন্য হতভাগ্য রাজা যেদেকিয়ার দুই চক্ষু উৎপাটিত করেছেনে। আর তাতেও নিবৃত্ত না হয়ে এখন আমাকে বন্ধুসুলভ উপহার দিতে এসেছেন।

[পরিচ্ছেদ।।বাইশ]

মিথিক চরিত্রে এ-জাতীয় মানবীয় সংবেদনা সত্যেন সেনের জীবনদর্শনের গৌরবময় প্রান্ত। জিল্লার সাথে অন্তঃশীলা সম্পর্ক এবং তজ্জনিত দ্বন্দ্ব যেরেমিয়ার মানবীয় সত্তারই প্রকাশ। অভিশপ্ত নগরী যেরশালেমের সামগ্রিক বিপর্যয়ের শূন্য, রিক্ত, শুষ্ক, অনুর্বর পটভূমিতে যেরেমিয়ার মধ্যেও জাগ্রত হয় সীমাহীন দীর্ঘশ্বাস। নিজ কণ্ঠে প্রচারিত বাণীর ভয়াবহ বাস্তবায়ন তাঁকে এক ধরনের আত্মগ্লানির মধ্যেও নিক্ষেপ করে। বাবিল-সেনাপতি এবং জিল্লার সাথে কথোপকথনে যে সত্যই উন্মোচিত হয়েছে। অহিকম-স্ত্রী জিল্লার মাতৃহৃদয়ের সর্বগ্রাসী হাহাকার এ-উপন্যাসের অন্যতর প্রান্ত। পুত্র গেদালিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুতে তার রক্তাক্ত হৃদয় বেদনা হয়েছে সর্বগ্রাসী। নিরুদ্দেশের দিকে ধাবমান যেরেমিয়ার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে উপন্যাস।

অভিশপ্ত নগরী উপন্যাসের শুরু এবং শেষ নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে। এবং উপন্যাসের আয়তনে ধারণ করা হয়েছে ধাবমান কালের এক বিশাল অধ্যায়। ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের মৌল সত্যটি যেন উচ্চারিত হয়েছে দাস-প্রেমিক গেদালিয়ার মধ্য দিয়ে। জননী জিল্লার উদ্দেশে পাঠানো পত্রে সে বলেছে :

সেই দৃষ্টি নিয়েই আমি আমাদের এই ভাঙ্গাচোরা, জীর্ণ আর রক্তমাখা সমাজে বসে- আর একটি অপরূপ সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখি, যে-স্বপ্ন একদিন সত্য হয়ে উঠবে। এত দুঃখ এত ব্যথা, এত অশ্রু- তার মাঝখানে বসেও আমি আমার স্বপ্নলোকের স্বাদগন্ধ অনুভব করি। [পরিচ্ছেদ।। বাইশ]

জীবন নির্বাচন ও রূপায়ণের অনন্যতা, ঘটনা ও চরিত্রের বহুমুখিতার মধ্যেও

এক দুর্লভ ঐক্যচেতনা এ-উপন্যাসকে মহাকাব্যিক শিল্পরূপের মর্যাদায় উন্নীত করেচে। কারণ, ইতিহাসের যে-কালপরিসর উপন্যাসের উপজীব্য, তার রূপায়ণে ক্লাসিক রূপরীতির প্রয়োগই অনিবার্য। সত্যেন সেন দক্ষতার সাথে বিষয়বস্তুর কালিক আবহ রক্ষার সমান্তরালে ভাষারীতিতেও মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন,

> এক. চাষীর হাতের ধারালো কাস্তে যেমন করে ফসল কেটে চলে, ওদের হাতের তরোয়ালও তেমনিভাবেই যে-পথ দিয়ে যাবে, সব কিছু সাফ করে নিয়ে যাবে।
>
> (পরিচ্ছেদ।। এক)
>
> দুই. উৎসুক দৃষ্টিতে সবাই মিসরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেমন করে ব্যাকুল কৃষক ঊর্ধ্বমুখী হয়ে তাকিয়ে থাকে বর্ষণহীন মেঘের দিকে।
>
> (পরিচ্ছেদ। সাত)

উপমার সারল্য ও প্রসারতা মহাকাব্যিক ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য। *অভিশপ্ত নগরী* উপন্যাসের এ-জাতীয় প্রচুর উপমার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। বিষয়ের সাথে প্রকরণের সঙ্গতি এ-উপন্যাসকে কালোত্তর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। 'এ-ধরণের উচ্চাশী ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় বিশেষ লেখা হয়নি।...স্বভাবতই হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রমুখ লেখকদের বাইবেল ভিত্তিক উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। বাংলায় এ ধরনের উপন্যাস এই প্রথম। সম্পূর্ণ নতুন, স্বাদে বৈচিত্র্যে অভিনব। লেখক এই পুরান কাহিনীকে নব তাৎপর্য দিতে চেয়েছেন। প্রেক্ষাপট ও কাহিনীর বিশাল গাম্ভীর্য পাঠককে স্তম্ভিত করে। লেখকের কৃতিত্ব, সেই গাম্ভীর্যকে বিনষ্ট করেননি।'[১০]

অভিশপ্ত নগরীর ভাববস্তু, জীবনকল্পনা ও চরিত্রভাবনা *পাপের সন্তান* উপন্যাসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সময়প্রবাহ, ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রপ্রবাহের ধারাবাহিকতা দু'টি উপন্যাসকে অভিন্নসূত্রে গ্রথিত করেছে। উপন্যাস দু'টির ঘটনাকালের ব্যবধান অর্ধ শতাব্দীরও কিছু বেশি। পারসিকদের আক্রমণে মহাপরাক্রমশালী বাবিল সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে বাবিল ও বাবিল সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকা পারস্য সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হয়। বাবিলস্থ বহু বছর নির্যাতিত নিপীড়িত ও নির্বাসিত ইহুদীরা নিজ বাসভূমি যেরুশালেমে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানালে পারস্যরাজ আর্তাসারেকস তা মঞ্জুর করেন। পারস্যরাজের ইহুদী পানপাত্রবাহক নেহেমিয়া যেরুশালেমের তীরশথ বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। নেহেমিয়ার নেতৃত্বে ইহুদীরা পারস্যরাজের স্থানীয় রাজকর্মচারী এবং প্রতিবেশী পরজাতীয়দের প্রবল বাঁধা অতিক্রম করে নতুন করে গড়ে তোলে যেরুশালেমের বিধ্বস্ত প্রাচীর। 'ইহুদী

জনসাধারণের প্রাণপাত প্রচেষ্টার ফলে নতুন যিরুশালেম গড়ে উঠল বটে, কিন্তু ধর্ম্মোন্মাদ ইহুদী সমাজপতিদের ধর্মের গোঁড়ামি, কঠিন রক্ষণশীল মনোভাব ও তীব্র পরজাতিবিদ্বেষ সমাজকে এক আত্মধ্বংসী আবর্তের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। শাস্ত্রীয় বিধান মানবিকতাকে গ্রাস করে চলল— ধর্মীয় অন্ধতার বেদীমূলে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক "পাপের সন্তানদের" বলি হতে লাগল। দুর্ভাগা ইহুদী সমাজকে এ জন্য ভবিষ্যতে বড় কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল— ইতিহাস তার সাক্ষী।'[১১] অভিশপ্ত নগরীতে বহির্বাস্তব-মুখ্য প্রেক্ষাপট, সমষ্টিচেতনার গুরুত্ব, ঐশ্বরিক বিধানের অনিবার্যতা স্বীকৃত হলেও *পাপের সন্তান* উপন্যাসে ব্যক্তির মানবীয় জীবনসংগ্রামের ভূমিকাই মুখ্য। প্রথা ও সংস্কারের শৃঙ্খল ইতিহাস-নায়কের নির্মম বিধানে বিপর্যস্ত হয়েছে। পাপ-ধারণার ওপর নির্মিত হয়েছে প্রেম-ধারণার জীবন্ত বিগ্রহ। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, জাতিশোষণ ও ধর্মশোষণ যে-পাপবৃক্ষেরবীজ রোপণ করেছে, প্রেমধর্মের সর্বত্যাগী আত্মপ্রকাশ সেই বিষবৃক্ষের মূল উৎসকেই আঘাত করেছে।

যেরুশালেম নগরীর পতনের পর বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার তাকে কেবল ধ্বংস্তূপেই পরিণত করেন নি, নগরীর সকল ইহুদীকে মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে বাবিলে নির্বাসনে পাঠান। সেই নির্বাসন, দাসত্ব ও লাঞ্ছনাপূর্ণ জীবন থেকে পারস্যরাজের কৃপায় মুক্তি ঘটলেও, সেই অনিচ্ছাকৃত নির্বাসিত জীবনই হলো তাদের ট্রাজিক পরিণতির কার্যকারণ। নির্বাসিত অবস্থায় দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের ফলে ইহুদীদের সাথে ক্যালদীয়দের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কেবল ক্যালদীয় নয়, অন্যান্য জাতির সাথেও ইহুদীদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। নব-নির্মিত যেরুশালেমের প্রত্যাবর্তনকারী 'বহু ইহুদী পরিবার' 'পরজাতীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ' ছিলো। ইহুদী ধর্মাচার্যদের কূপমণ্ডুকতা ও অন্ধ জাত্যাভিমান এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো যে পরজাতীয়দের সাথে সম্পর্কসূত্রে জাত সন্তানদেরকে তারা 'পাপের সন্তান' হিসেবে ঘোষণা দিলো। এর ফলে, যেরুশালেমের যে নৈতিক ও মানবিক সঙ্কট উত্থিত হলো, তার মীমাংসা সন্ধান ছিলো অসম্ভব। মিকা ও সদরার জীবনধারায় যে অস্বাভাবিক ইঙ্গিত বিদ্যমান, তার মূলেও রয়েছে ইতিহাসের সেই কালো প্রবাহের বিসর্পিল গতি-প্রকৃতি।

পাপের সন্তান উপন্যাসের মিকা বাবিলে নির্বাসিত জীবন-যাপনকারীদের একজন। পিতৃ-পিতামহের উত্তরাধিকার সূত্রেই সে বাবিলের সম্পদশালী মালিক নারগেল সারেজেরের গৃহের ক্রীতদাস। ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ক্রীতদাসের মতো লাঞ্ছনা ও গ্লানিময় জীবন থেকে সে মুক্ত। প্রভুর স্নেহের আশ্রয়

এবং প্রভুকন্যা শদরার প্রণয় তার দাসজীবনকে করেছে আনন্দময়। পারস্যরাজের আনুকূল্যে ইহুদী জাতি মাতৃভূমি যেরুশালেমে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেলে মিকার মধ্যেও য়িহুদী জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। এই বোধ মিকার নবজন্ম সাধন করে। নবলব্ধ আবেগের উন্মাদনায় 'য়িহুদী মিকা এতোদিনকার ক্যালদীয় ভাষা ও পোষাক পরিত্যাগ করে, ক্যালদীয় প্রভুর প্রদত্ত সমস্ত অনুগ্রহকেও সে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে, এমনকি প্রণয়িনী শদরাকে পরিত্যাগ করার প্রস্তুতি গ্রহণেও সে বিচলিত হয় না।'[১২] উপন্যাসের সূচনায় শদরা ও মিকার কথোপকথনে এই দ্বন্দ্বময় অবস্থায় স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে :

: যাহুদা তো তোমার জন্মভূমি নয়, তুমি তাকে চোখেও দেখনি কোনদিন। তবু তার কথা বলতে বলতে তোমার চোখ অমন ছলছল করে ওঠে কেন, কেন তোমার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে; আমাকে বলতে পার মিকা?

মিকা চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিল না।

: কই তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না?

: তুমি বুঝবে না শদরা, বুঝবে না। তুমি করুণাময়ী, তুমি কোমলপ্রাণ, তবু তুমি এ ব্যথা বুঝবে না। এ যার বোঝার সেই শুধু বোঝে।

শদরা অধৈর্য্য হয়ে উঠল,

: না, এ চলবে না। আমাকে বুঝতেই হবে, কেন তুমি আপনাকে এমন করে তিলে তিলে হত্যা করে চলেছ? কোথায় গেল সেই আনন্দ উজ্জ্বল মুখখানি, প্রাণখোলা উচ্ছল হাসি? মিকা, মিকা, এমন করে আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা। আমরা দু'জন চিরদিনের সুখ-দু :খের সাথী, এই অনুচ্চারিত সত্যে আমরা কি পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ নই?

: শদরা, যাহুদার মাঠি আমায় টেনে। যাহুদার মানুষ— এই দুঃখী মানুষগুলি আমায় টানে। আমার শিকড় ছিড়ে উপড়ে আসে। আমার রক্তমাংশ, আমার অস্থিমজ্জা সেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে। আমি কেমন করে তোমাকে বোঝাব।

[পরিচ্ছেদ।।এক][১৩]

প্রেম এবং য়িহুদী জাতীয়তাবোধের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত মিকার চৈতন্যের বিচিত্ররূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণে ঔপন্যাসিকের দক্ষতা বিস্ময়কর। শদরার প্রেমস্পর্শ, করুণাস্পর্শও মিকার নবোদ্ভূত আবেগ প্রশমনে ব্যর্থ হয়। তার মধ্যে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এই বোধ-'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আমি একজন য়িহুদী।' শদরার উদ্দেশে সে উচ্চারণ করে : 'আমি বুঝতে পেরেছি আমি বাবিলের কেউ নই, বাবিলের সামান্য তৃণ-খণ্ডটুকুর উপরেও আমার কোন অধিকার নেই, দাবী নেই— ক্ষমতাও নেই। আমার ভাগ্য

হতভাগ্য য়িহুদী জাতির সংগে জড়িত, আমার ভবিষ্যৎ তাদেরই মাঝখানে।' (পরিচ্ছেদ ।। এক)। একদিকে শদরা অন্যদিকে য়িহুদী জাতীয়তা -- দু'য়ের টানাপোড়েনের মধ্যে মিকা অবশেষে তার ক্যালদীয় অতীত, তার মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে 'য়িহুদীর ধর্মে আর য়িহুদীর জাতীয়তায় দীক্ষিত হয়ে গেল।' (পরিচ্ছেদ ।। দুই)। ক্যালদীয় 'ভালবাসা পাপ' এই অনুভব য়িহুদীর জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত মিকার মনোজগতে প্রতিনিয়তই অনুরণিত হতে থাকে। যাহুদার অলঙ্ঘ্য বিধানের মতোই শদরা তার প্রেমকে নিয়তির মতো গ্রহণ করে। এবং মিকার উদ্দেশে উচ্চারিত ভবিষৎদ্বাণীর মধ্যেই যেন সঙ্কেতায়িত হলো মিকা ও শদরার পরিণাম :

> তুমি যতই বলনা কেন, তুমি মনে প্রাণে য়িহুদী নও! হয়তো একদিন বুঝবে। কিন্তু আজ তুমি তা কিছুতেই মানবে না। আমি আজ যদি তোমাকে আমার একান্ত করে ধরে রাখতে চাই, আমি পারব না। শুধু তোমাকে দুঃখ দেব। আর নিজেও দুঃখ পাব। না, আমি সে চেষ্টা করব না। তুমি তোমার যা কর্তব্য বলে মনে কর, করে যাও, শুধু আমাকে তোমার জীবনের সাথী করে নাও।—
>
> : কিন্তু শোন মিকা, তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ না। আমি জানি জীবনভর দুঃখের বোঝা বয়ে আমাকে চলতে হবে। আমার যে অনেক বাঁধা। কিন্তু কি করব, তবু আমাকে তোমার সংগ দিতে হবে, এই যে আমার নিয়তি।
>
> [পরিচ্ছেদ ।। তিন]

মিকা–শদরার অন্তর-বাহির জীবনপরিক্রমার সমান্তরালে প্রবাহিত হতে থাকে বিচিত্র ঘটনাস্রোত। অভিশপ্ত য়িহুদী জাতির যেরুশালেম–প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি পারস্যরাজ অনুমতি দেবেন কিনা সে বিষয়ে সংশয়, বাবিল, আসরিয়া, আক্কাদিয়া ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের য়িহুদী নেতৃবৃন্দের গোপন শলাপরামর্শ যেরুশালেমের তীরশথ বা শাসনকর্তা হিসেবে নেহেমিয়ার নিযুক্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসে। য়িহুদী জাতীয়বোধে উদ্দীপ্ত মিকার মূল লক্ষ্য স্বপ্নের নগরী যেরুশালেমে প্রত্যাবর্তন। নারগেল সারজেরের যুক্তি ও সত্যকে উপক্ষো করে মিকা ও শদরা যেরুশালেমগামী ধাবমান জনস্রোতের অনুগামী হলো। এই ধাবমান জনস্রোতের বর্ণনায় সত্যেন সেনের অনুভবের অন্তরঙ্গ রূপ সুস্পষ্ট :

> ওরা চলেছে। দলে দলে চলেছে। বাবিলের নির্বাসিত ইসরায়েল সন্তানেরা: বাবিল ছেড়ে স্বদেশের দিকে ফিরে চলেছে। যে স্বদেশে তারা হয়তো জন্মায়নি, যে স্বদেশকে হয়তো চোখেও দেখেনি কোনদিন। আহা, তবু তো স্বদেশ। তাদের পিতৃপুরুষের স্বদেশ। যে দেশ একদিন যিহোবা তাদেরই জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। এ যে সেই দেশ, মিসর থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত অস্থির ও যাযাবর জীবনযাপন করে অবশেষে

ইসরায়েলের সন্তানগণ যেখানে স্থিতি লাভ করল, আর প্রভুর আশীর্বাদে বংশের পর বংশ ধরে তাদের সন্তান-সন্ততি বনের পশু, নদীর মাছ আর আকাশের তারার মতো বেড়েই চলল। [পরিচ্ছেদ ।। নয়]

যেরুশালেমের উদ্দেশে গমনকারী প্রথম দলের নেতৃত্ব দেন আচার্য্য ইষ্রা। এরকমই একটা দলের সাথে যাত্রা করে মিকা ও শদরা। কিন্তু এক সময় তারা পথ হারিয়ে এক প্রান্তরের মধ্যে এসে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে ওই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন যেরুশালেমের নবনিযুক্ত তীরশথ নেহেমিয়া। মিকা ও শদরা তাঁর রাজকীয় অভিযাত্রার সঙ্গী হলো। 'এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দিনের পর দিন ওরা চলছে, দিনের পর দিন যাহুদার ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। সারাদিন পথ চলে আর রাত্রি বেলা তাঁবু খাঁটিয়ে বিশ্রাম করে।' (পরিচ্ছেদ ।। এগারো)। 'ধর্মপ্রাণ, সচ্চরিত্র, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, বহুলোকের শ্রদ্ধার পাত্র' নেহেমিয়ার আশ্রয়ে মিকা ও শদরা শেষ পর্যন্ত যেরুশালেম নগরীতে উপনীত হয়। তাদের স্বপ্ন, আবেগ ও রোম্যান্টিক আকাঙ্ক্ষার জীবনলোক অচিরেই বাস্তবতার নির্মম আঘাতে ম্রিময়াণ হতে থাকে। বাধাগ্রস্ত হয় নেহেমিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম। য়িহুদী-বিদ্বেষী সনবল্লাট ও তার অনুচর টোবিয়া তীরশথ হিসেবে নেহেমিয়ার নিয়োগে অপ্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ হয়। 'নেহেমিয়ার বুঝতে বাকী ছিল না যে তিনি তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। এই য়িহুদী বিদ্বেষী হরোনীয় তাঁর কাজের পথে সর্বতোভাবে বাধার সৃষ্টি করবে। কিন্তু নেহেমিয়া ভয় পাবেন কেন? যিহোবা এতদিনে তাঁর সন্তানদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। পারস্যরাজ আজ তাদের সহায়। প্রবাসী য়িহুদীরা সবাই ফিরে আসছে। সনবল্লাট তাঁর কি করবে?' (পরিচ্ছেদ ।। বারো)। এভাবেই শুরু হলো 'ভগ্ন, জীর্ণ, শ্রীহীন যেরুশালেম নগরী' পুনঃনির্মাণের কাজ। শদরার ক্যালদীয় পোশাক প্রতি মুহূর্তেই তাকে স্বতন্ত্র করে দেয়, তার অন্তর্গত, রক্তবাহিত জাতিত্ব চেতনা এই জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ করে দেয় শদরাকে। প্রণয়ের জন্য সে তার মাতৃভূমি, স্বজনদের পরিত্যাগ করলেও আদিকল্প (Archetype) ধর্মবোধকে বিসর্জন দিতে সে কুণ্ঠিত। শদরার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনাকরুণ চিত্ররূপ উন্মোচন করেছেন সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক :

য়িহুদীরা নতজানু হয়ে মন্দিরের ভিত্তি চুম্বন করল। তারপর সবাই এক যোগে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে চলল। শুধু একজন দাঁড়িয়ে রইল। সে শদরা। মিকা হঠাৎ চমকে উঠে দেখল প্রার্থনারতদের মধ্যে শদরা নেই। কোথায় গেল শদরা? পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, শদরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস্ত হয়ে মিকা তাকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকল। কিন্তু শদরা দেখেও দেখল না, উদ্ধতভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সর্বনাশ! কেউ যদি দেখে ফেলে, কি

মনে করবে।

মিকা উঠে গিয়ে তাকে হাত ধরে টানল। শদরা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। বিষম বিপদ যে! মিকা তার কোন বাঁধা মানল না, জোর করে টেনে নিয়ে এসে তাকে তার পাশে বসিয়ে দিল। শদরা মাটির উপর ভেঙ্গে পড়ল। রাগে, অভিমানে তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

[পরিচ্ছেদ।। তেরো]

মিকার ধর্মাবেগের আতিশয্য শদরার অন্তর্লোকের প্রকৃত রূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। 'মিকার কাছে সব চেয়ে বড় সত্য যিহোবা আর য়িহুদী জাতি। শদরাকেও সে ভালবাসে, সে ভালবাসা মিথ্যে নয়, কিন্তু সে ভালবাসা গৌণ।' ফলে, 'হাজার লোকের মাঝেও' বিচ্ছিন্ন ও একা হয়ে যায় শদরা। শদরার এই অন্তর্বেদনা ও হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে মিকার উদ্দেশে : 'আমি তোমার ভালবাসার আকর্ষণে আমার দেবতার মন্দির ছেড়ে দূরে, বহু দূরে চলে এসেছি। কিন্তু দেবতা আমার হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন। আমি সজ্ঞানে সে কথা দেখিনি।...যখন তুমি জোর করে আমায় টেনে বসিয়ে দিলে, আমার মনে হোল, এতো আমার মিকা নয়, এ যেন ধর্মোন্মাদ য়িহুদী জাতি যিহোবার মন্দিরের পাষণ চত্বরে আমাকে চুল ধরে আছড়ে ফেলে দিল।' (পরিচ্ছেদ ।। চৌদ্দ)। সামূহিক নির্জ্ঞানের (Collective Unconscious) মৌল চেতনা শদরার আত্মস্বরূপকে নবরূপে উন্মোচন করেছে। ইতিহাসের এক ট্রাজিক জীবন সত্যের রূপ অঙ্কন করতে গিয়ে সত্যেন সেন দুটি মাত্রাকে ব্যবহার করেছেন। এক. ব্যক্তির মাত্রা; দুই. সমাজের মাত্রা। যিহোবার অলঙ্ঘ্য বিধান একদিকে যেমন যেরুশালেম ও তার জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, নিয়তির মতো; তেমনি ইতিহাসের জান্তব, দৈব আবর্ত মিকা--শদরার জীবননাট্যেও সংযোজন করেছে ভয়ংকর ট্রাজেডির বীজ।

নেহেমিয়ার সুপরিকল্পনা ও জনতার অক্লান্ত পরিশ্রমে এক সময় পুনর্নির্মিত হয় যেরুশালেম নগরী। সনবল্লাট-টোবিয়ার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও অদম্য মনোবল, বিচক্ষণতা, জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি দিয়ে নেহেমিয়া এই অসাধ্য করেন। কিন্তু এ– জন্য তাঁকে বিচিত্র বাঁধা অতিক্রম করতে হয়। সনবল্লাট প্রথমে পারস্যরাজের একটি পত্র উপস্থাপন করে, যা মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, যেরুশালেম ও তার পার্শ্ববর্তী কিছুসংখ্যক স্বার্থান্ধ, সুবিধাবাদী ও য়িহুদী বিদ্বেষী লোকের প্রতিনিধি হিসেবে সনবল্লাট ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। তারা একাধিক ছদ্ম নবী বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও ব্যবহার করে। যেমন, নবী হিলকিয়া, স্ত্রী নবী নোয়াদিয়া। এর ফলে য়িহুদী জাতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে,

এবং ষড়যন্ত্রকারী ও নেহেমিয়ার অনুসারীদের মধ্যে তীব্র সংঘাত বেধে যায়। এমনকি, নেহেমিয়ার গৃহও এক সময় ভস্মীভূত হয় চক্রান্তকারীদের হীন চক্রান্তে। কিন্তু, এর ফল হয় বিপরীত। সমগ্র য়িহুদী জনগোষ্ঠী আরো ঐক্যবদ্ধ হয়। 'নেহেমিয়া অবাক হয়ে দেখলেন, কাল পর্যন্ত যারা প্রতিপক্ষের ভয়ে জড়সড় হয়েছিল, এই একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের ভয় কেমন করে কেটে গিয়েছে।' গভীর বিশ্বাস ও মনোবল নিয়ে তিনি সবার উদ্দেশে বরাভয় বাণী প্রদান করলেন :

> তোমার চেয়ে দেখ, ওদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। ওরা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল, আমরা তা কাটিয়ে উঠেছি। ওরা গুপ্ত হত্যা করে আমাদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছিল, স্বয়ং প্রভু আমাদের রক্ষা করেছেন। এসো, আমরা সেই প্রভুর কথাই স্মরণ করি, যিনি মহান, যিনি ভয়ঙ্কর। আর এসো আমরা তাঁরই করুণার স্নেহচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের ভাইদের, স্ত্রীদের, সন্তান-সন্ততির আমাদের পশু আমার আবাস গৃহ ও ক্ষেত্রসমূহের রক্ষার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করে চলি। প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন। সমস্ত পৃথিবী যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবু তো আমরা ভয় পাব না।
>
> [পরিচ্ছেদ।।আঠারো]

কেবল দৈবীপ্রেরণা নয়, মানবশক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অনিবার্যতাও এখানে স্বীকৃত। সভ্যতাবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ঐশীবাণীর প্রবক্তারাও জনবিচ্ছিন্ন, উর্ধ্বচারী ছিলেন না, সংঘশক্তির কল্যাণধর্মী কার্যক্রমই তাঁদের অগ্রযাত্রাকে করে তুলেছে অনিবার্য। ঐশী ব্যক্তিত্ব না হলেও নেহেমিয়ার সমগ্র কর্মধারা পবিত্র নগরী যেরুশালেমের কল্যাণেই নিবেদিত। এভাবেই একসময় যেরুশালেমের রক্ষাকারী প্রাচীরের কাজ শুরু হয়ে যায়। 'হাজার হাজার লোকের জয়ধ্বনির মধ্যে ওরা প্রাচীরের ভিত্তি স্থাপন করল। সেই জয়ধ্বনির শব্দ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। পরজাতীয়দের কানে তা যেন কাঁটার মতই গিয়ে বিঁধল।' প্রতিপক্ষের বিচিত্র প্রকাশ্য ও গোপন চক্রান্ত ব্যর্থ করে অবশেষে 'নেহেমিয়ার দুঃসাহসিক প্রাচীর নির্মাণ পরিকল্পনা' সম্পূর্ণ হয়। 'যিরুশালেমের অধিবাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইলুল মাসের পঞ্চম দিনে সকল দ্বার সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ প্রাচীর গড়ে উঠল।' যাহুদার য়িহুদীরা এবার নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করল, যিরুশালেম নগরী আবার এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে চলেছে।' (পরিচ্ছেদ ।। আঠারো]। নবনির্মিত যেরুশালেম নগরীতে দেশ দেশান্তর থেকে দলে দলে য়িহুদীর আগমন ঘটতে থাকে। এবং তা দেখে শঙ্কিত হতে থাকে প্রতিবেশী জাতিসমূহ।

যেরুশালেম নগরীর পুনর্নির্মাণের ঘাত-প্রতিঘাতময় ঘটনাপ্রবাহের অন্তরালে আর এক দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত অন্তর্নাটক অভিনীত হচ্ছিল মিকা ও শদরার জীবনে। 'সম-ঐতিহ্য' ও 'য়িহুদী চেতনা'র সূত্র ধরে নগরীতে সমবেত জনগোষ্ঠীর মন-

মানস সঙ্গত কারণেই নিয়ন্ত্রিত ছিলো ধর্মবোধের আতিশয্য ও আবেগের প্রাবল্যের দ্বারা। দিবস প্রতিপালনের সময় সমবেত য়িহুদীরা যিহোবার নামে শপথ গ্রহণ করে:

> আমরা যিহোবার দাস মোশি কর্তৃক প্রদত্ত যিহোবার ব্যবস্থামত চলব; যিহোবার আদেশ, শাসন ও বিধি সকল যত্নপূর্বক পালন করব।
>
> পরজাতীয় লোকদের সংগে আপনাদের কন্যাদের বিবাহ দেব না ও আমাদের পুত্রগণের জন্য তাদের কন্যাদের গ্রহণ করব না।
>
> [পরিচ্ছেদ।। উনিশ]

এই শপথ উচ্চারণের মধ্য দিয়েই য়িহুদী মিকা ও ক্যালদীয় শদরার অন্তর্সংঘাতের সাথে যুক্ত হলো লোকাচার, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও জন্মান্ধ য়িহুদী জাতির নির্মম, অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ।

যেরুশালেম নগরী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর নেহেমিয়ার মানবকল্যাণকামী কার্যক্রমের ওপর পুরোহিতন্ত্রের প্রাধান্য প্রবল হতে থাকে। দীর্ঘকাল নিগৃহীত, লাঞ্ছিত য়িহুদীর জাতির মধ্যে অন্ধসংস্কার ও ধর্মোন্মাদনার পুনরুজ্জীবন ঘটে। বহু দিনের সংস্রবের ফলে স্বাভাবিকভাবেই অসংখ্য য়িহুদী পরজাতীয়দের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। ধর্মীয় প্রবক্তারা এই সম্পর্ককে অবৈধ ঘোষণা করে এবং এই সম্পর্কজাত নিষ্পাপ সন্তানদেরকে চিহ্নিত করা হয় "পাপের সন্তান" হিসেবে। মিকার ধর্মাবেগ প্রথম পর্যায়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত থাকলেও তার মোহভঙ্গ হতেও সময় লাগে না। হানানি ও মিকার কথোপকথনে এ-সত্যেরই প্রকাশ ঘটেছে:

> "এই য়িহুদী সমাজকে আমি যতই দেখি, ততই বিস্মিত হয়ে যাই। এরা ধার্মিক নয়, এরা ধর্মোন্মাদ, এরা বাইরের শুচিতা নিয়ে মাতামাতি করে, কিন্তু ভিতরে ক্লেদ জমিয়ে রাখে। এদের কূপমণ্ডুকতা ও অন্ধ আত্মাভিমান এদের পৃথিবীর সকল জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করে রেখেছে।
>
> হানানির কথা শুনে মিকা অবাক হয়ে গেল। সে বলল, হানানি এসব তুমি বলছ কি? কোন য়িহুদীর মুখ থেকে য়িহুদী সমাজ সম্পর্কে ও রকম তীব্র মন্তব্য আমি কখনও শুনিনি। এ কথা সত্য, বাবিলে বসে যে আদর্শ য়িহুদী সমাজের স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম সে স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেছে। [পরিচ্ছেদ।। কুড়ি]

'য়িহুদীদের ধর্মজগতের মধ্যমণি' আচার্য ইষ্রা যখন নির্মমভাবে ঘোষণা করলেন : 'পরজাতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই। তাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই ঘটবে। আর তাদের গর্ভজাত সন্তানেরা পাপের সন্তান। এরা যত শীঘ্র লোপ পাবে যিহোবার রাজ্য তত নিষ্কলংক হয়ে উঠবে।' [পরিচ্ছেদ ।।

একুশ]। হানানির যুক্তি ও বিবেচনাবোধ যিহোবার এই অন্ধ-অনুশাসনের কাছে বারবার পরাস্ত হতে থাকে। এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে মিকা-শদরার জীবন। আচার্য ইষ্রার আদেশ জারি করার সময়েই মিকার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে শদরা। মিকা ও শদরা যখন ধর্মের নির্মম বিধানের মুখোমুখি হবার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন, তখন ততোধিক নির্মম একটি পত্র হস্তগত হয় আচার্য ইষ্রার। নারগেল শারেজের মিকা ও শদরা সম্পর্কে ঐ পত্রে যে তথ্য প্রদান করে, তা প্রথাগত মানবীয় মূল্যবোধের জন্য মর্মান্তিক : 'আমার কন্যা শদরা মিকার সঙ্গে বাবিল ছেড়ে চলে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা এখন যিরুশালেমে। ওদের দুজনকে বলবেন, মিকা আমার পুত্র যিহুদিনীর গর্ভজাত পুত্র। কাজেই তার সঙ্গে কোন মতেই শদরার বিবাহ হতে পারে না। আর যদি ইতিমধ্যে বিবাহ হয়ে গিয়েও থাকে, তবে তা বিধিসংগত বলে গ্রাহ্য নয়।' (পরিচ্ছেদ ।। ছাব্বিশ)। উক্ত চিঠি পাঠ ও তার প্রতিক্রিয়ায় মিকা শদরার যে সীমাহীন অন্তর্যন্ত্রণা, ঔপন্যাসিক গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন :

> মিকার হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে গেল। সে মাথা তুলে নেহেমিয়ার দিকে তাকাল। কিন্তু কোথায় নেহেমিয়া? এমন অলক্ষ্যে কেমন করে মিলিয়ে গেলেন? তবে কি— তবে কি সবই একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র? তার পায়ের তলা থেকে মাটি ধ্বসে পড়ছে, সামনে অন্ধকারের অতল গহবর। তবু তার মধ্যেও একটু ক্ষীণ আশা ঝিকিমিকি করে উঠল-হয়তো সবই একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু না, না, ওই তো সেই বিষ মাখা চিঠিটা ঘরের মেজের উপর বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওই যে দরোজাটা হাঁ করে আছে, যে পথ দিয়ে নেহেমিয়া এসেছিলেন। আর ওই ওখানে কে অমন করে ছিন্ন লতার মত লুটিয়ে পড়ে আছে? কে ওই— শদরা না? হ্যাঁ, শদরাই তো। তবে তো এ স্বপ্ন নয়। মিকা কেমন আচ্ছন্নের মত যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। সমস্ত চিন্তা যেন গুলিয়ে আসছে। জাল-জাল-জাল— চারদিকেই জাল। এই জাল থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পথ নাই, শিকারীরা চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছে।
>
> [পরিচ্ছেদ।।ছাব্বিশ]

বিচার সভায় তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলেও নেহেমিয়ার সুচিন্তিত অভিমত এই শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করে। নেহেমিয়ার মানবমুখী ও জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বলতার প্রকাশ তাঁর উচ্চারণ : 'অপরাধীদের ব্যাভিচারের অভিযোগ সুপ্রমাণিত হয়েছে। সে সম্পর্কে আমার কোনই বক্তব্য নাই। কিন্তু একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অপরাধীরা উভয়েই জন্মসূত্রে পরজাতীয় ও পরধর্মের অনুসারী। সেই কারণে আমাদের ধর্ম শাস্ত্রোক্ত এই সামাজিক বিধান এদের ওপর প্রয়োগ করা সংগত হবে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে খুবই সন্দেহ আছে। প্রশ্ন উঠবে, এদের সম্বন্ধে কি তবে করণীয়? আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, এদের অবিলম্বে এদেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হোক যাতে এদের সংস্পর্শে

আসার ফলে এই পাপ আমাদের সমাজদেহে সংক্রামিত হতে না পারে।' [পরিচ্ছেদ।। সাতাইশ]। শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেলেও বাইরের ধর্মান্ধ, ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত জনতার আক্রমণ মিকা ও শদরার জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। নেহেমিয়া ও হানানির হস্তক্ষেপ ও সহায়তায় তারা যেরুশালেম ত্যাগে সমর্থ হয়। আর সত্য ও ন্যায়ের পথের নিঃসঙ্গ পথিক নেহেমিয়া উপলব্ধি করেন, 'আজ আমি একা, বড় একা। আর আমি বড় ক্লান্ত।' যেরুশালেম ছেড়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর মিকা ও শদরা মিসরে উপনীত হয়। বাইরের সমগ্র বাধার পর্বতসমূহ অতিক্রম করলেও অন্তর্জগতের নির্মম বোধের প্রাচীর লঙ্ঘন তখনো বাকি। আত্মবিনাশের পরিবর্তে এক সদর্থক মীমাংসায় উপনীত হয় তারা— 'নিষ্পাপ আমরা,, নিষ্কলংক আমরা,— আমরা কেন ওদের কাছে মাথা নীচু করে থাকব? কে কবে, কোথায় তার অসংযত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার ফলে এক সন্তানের জন্ম দিয়েছিল–তার দায়–দায়িত্ব কি আমাদের বয়ে নিয়ে চলতে হবে?' [পরিচ্ছেদ ।। উনত্রিশ]। নীল নদের মর্মরিত জলের পটভূমিকায় তথাকথিত 'পাপের সন্তান' নয় 'ফুলের মত একটি শিশু'র প্রতীক্ষায় জেগে ওঠে মিকা ও শদরার প্রেমময় সত্তা।

যিহোবার অলঙ্ঘ্য বিধান, রাতের আকাশে শদরার জীবনে একটি নক্ষত্রের পৌনঃপুনিক উপস্থিতি, ক্যালদীয় পিতার ঔরসজাত হওয়া সত্ত্বেও মিকার আতিশয্যপূর্ণ ধর্মাবেগ— প্রভৃতি ট্রাজিক পরিণামের ইঙ্গিতবহ। কিন্তু এক শুদ্ধ, সুন্দর মিলনান্তক পরিনামের মধ্যে সমাপ্ত হয় উপন্যাস। এবং যে মীমাংসিত বোধটি উচ্চারিত হয়— তার মূলে রয়েছে সর্বাধুনিক জীবনচেতনা। সত্যেন সেনের বস্তুবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রাগ্রসর জীবনবোধের প্রতিফলন *পাপের সন্তান* উপন্যাসকে এক সর্বজনীন শিল্পমাত্রায় উন্নীত করেছে, শিল্পের ইতিহাসে যা তুলনারহিত। গ্রীক ট্রাজেডির নিয়তিনির্ধারিত বিশ্ববিধানের তাৎপর্য এখানে গৌণ। জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের অস্বাভাবিকতাই মিকা–শদরার অসম্ভব সম্পর্কের কার্যকারণ— যেখানে নববোধে জাগ্রহ হওয়ার বিকল্প আত্মবিনাশ, মৃত্যু। মিথিক তাৎপর্যে চিহ্নিত হলে তাদের এই উত্তরণ শিল্পসঙ্গত।

অভিশপ্ত নগরী-পাপের সন্তান প্রকরণ বিচারেও স্বাতন্ত্র্যস্পর্শী শিল্পকর্ম। সংলাপ–আশ্রয়ী, ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে আখ্যানের কেন্দ্রীয় ঐক্য বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা থাকে। সময়ের কার্যকারণশৃঙ্খলকে সত্যেন সেন জীবনবোধের কেন্দ্রীয় আবেগের সাথে সমন্বিত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পবোধের ক্ষেত্রে বাইবেল উপকরণ-উৎস মাত্র। বাইবেলের ভাববস্তু মানবীয় সংগ্রামের

আবহমানতার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। পাপের সন্তান-এ ঔপন্যাসিকের জীবনকল্পনা অনেকটা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। নায়ককল্প পুরুষ হয়েতো বা এ-উপন্যাসে নেহেমিয়া, কিন্তু সূচনা ও সমাপ্তি, প্রতিশ্রুতি ও প্রমাণ মিকা-শদরার চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়েই উপস্থাপিত। ঘটনার ব্যাখ্যা, চরিত্রের উত্থান-পতন, যেরুশালেমের পতন-উত্থান-সবকিছুই সংলাপের মাধ্যমে এসেছে। ইতিহাসের বিশাল বিস্ময়কর চিত্রপট তুলে ধরায় কৃতিত্ব লেখককে দিতেই হয়।'[১৪] ধর্মাদর্শ সন্ধানের পরিবর্তে ঔপন্যাসিক মিথসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রয়োগ করেছেন উপন্যাসে। 'মিথের নবরূপায়ণে, গদ্যরীতির ধ্রুপদী বিন্যাসে এবং বক্তব্যের সমকালীন সংকট বিবেচনায় এ-দু'টি উপন্যাস স্বতন্ত্র, অনতিক্রান্ত।'[১৫]

তিন

সত্যেন সেনের *বিদ্রোহী কৈবর্ত* উপন্যাসের আখ্যান-উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে পাল বংশীয় রাজাদের শাসনামল। ধর্মযাজক, সামন্ত প্রভু ও সম্রাটের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে শোষিত-নিপীড়িত কৈবর্তদের বিদ্রোহ এ-উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য। ঔপন্যাসিকের সমকালস্পর্শী জীবনচেতনা এ-উপন্যাসকে পরিণত করেছে উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদী জীবনাকাঙ্ক্ষার শিল্পরূপে। পটভূমি হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাস-উৎসের প্রয়োগ এ-সত্যেরই যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করে। "বিদ্রোহী কৈবর্ত উপন্যাসের মূল কাহিনীটি কাল্পনিক নয়, এর বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তি বিদ্যমান। বাংলার পাল রাজত্বের সময়ে বরেন্দ্রের শূদ কৈবর্তদের বিদ্রোহের উল্লেখ ইতিহাসে আছে। কিন্তু শূদ্র বিরোধী অভিজাতদের রচিত ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহকে অবশ্যই গৌরবমণ্ডিত রূপে অঙ্কিত করেনি, কিংবা এ বিদ্রোহের কোনো অনুপুঙ্খ বর্ণনাও কোথাও রক্ষিত হয়নি। এ-কালের বিপ্লবকামী বুদ্ধিজীবী সত্যেন সেন তাঁর ঐতিহাসিক কল্পনার প্রয়োগে কৈবর্ত-নায়ক দিব্বোককে নতুনভাবে সৃষ্টি করে তুলেছেন, সে সময়কার সমাজপরিবেশকে তার আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব সমেত ইতিহাস থেকে তুলে এনে এ যুগের মানুষের সামনে এক জীবন্ত প্রতিমার মতো সংস্থাপন করেছেন।'[১৬] ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবম শতাব্দীতে বরেন্দ্র অঞ্চলে যে শূদ্র জাগরণ-সূচিত হয়, দিব্বোক কৈবর্তের নেতৃত্বে সেই জাগরণ প্রচণ্ড বিদ্রোহে রূপ লাভ করে এবং এর ফলে রাজা মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্রের সাথে মানবরসের শিল্পিত সংশ্লেষ *বিদ্রোহী কৈবর্ত* উপন্যাসকে নবতাৎপর্যে উন্নীত করেছে।

এক পৌরাণিক আবহ সৃষ্টির মাধ্যমে *বিদ্রোহী কৈবর্ত* উপন্যাসের সূচনা। রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পঠিত হচ্ছে মহাভারত, রাজমাতা শংখদেবীসহ অনেকেই শ্রোতার আসনে উপবিষ্ট। শংখদেবীর পরিচয় উপস্থাপন সূত্রে রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে :

> মহারাজ বিগ্রহপালের বিধবা পত্নী রাষ্ট্রকুটনন্দিনী শংখদেবী মেয়েদের নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী আসনে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন। পাঠক ঠাকুরের কাহিনীর দিকে তাঁর মন ততটা নাই, তাঁর কান উচ্চকিত হয়ে আছে তাঁর কাছাকাছি যেসব মেয়েরা আছে তাদের বলাবলির দিকে। কিন্তু সে কথা বুঝবার উপায় নাই। তাঁর মুখের দিকে তাকালে সম্ভ্রম জাগে, আর জাগে সহানুভূতি। কিন্তু সেই সহানুভূতি মুখে প্রকাশ করবার মত সাহস নাই কারু। লোকমুখে এ কথা প্রচলিত হয়ে এসেছে মহারাজ বিগ্রহপাল তাঁর শেষ বয়সে নামেই মাত্র রাজা ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও রাজ-দণ্ডটা মহারাণী শংখদেবীর হাতেই ন্যস্ত ছিল। আজ তার সপত্নী পুত্রের রাজত্বে তাঁর এই দুর্দশা। তাঁর উপযুক্ত পুত্র কুমার রামপাল কারাগারের আর তিনি নিজেও প্রাসাদে বন্দী জীবন যাপন করে চলেছেন। মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল প্রকাশ্যে তাঁকে রাজমাতার সম্মান দিলেও ভিতরের কথাটা জানতে লোকের বাকী নাই। এক কালে যিনি রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, এখন তাঁর স্বাধীনভাবে চলবার ফিরবার, মন খুলে কথা বলবার সুযোগটুকু পর্যন্ত নাই।[১৭]

রাজমহিষী নন্দা দেবীর উপস্থিতি, 'বিদ্যুৎ শিখার মত চঞ্চল একটি মেয়ে'র রহস্যময় আগমন ও প্রস্থান, শংখদেবীর অসুস্থতা, রাজবৈদ্য হরিগুপ্তের সাথে তাঁর গোপন শলাপরামর্শ প্রভৃতি রাজ অন্তঃপুরের সংঘাতদীর্ণ ও দ্বন্দ্বময় অবস্থার স্বরূপনির্দেশক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাজপ্রশাসনের অন্তর-বাহিরের বিচিত্র রূপের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত। রাজা মহীপাল, প্রথম অমাত্য বরাহস্বামী, মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভ, মহাপ্রতিহার কীর্তিবর্মা'র গূঢ় রাষ্ট্রীয় বিষয়সম্পর্কিত আলোচনা থেকেই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবক্ষয় ও অব্যবস্থার স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তদের প্রতিবাদ ও অসন্তোষের ক্রমবিস্তার তাদেরকে করে তুলেছে শঙ্কিত। পদ্মনাভের উক্তিতে প্রতিবাদী কৈবর্তদের জাগরণের প্রকৃতি অনুধাবনসাধ্য : 'এবার কিছুদিন আগে ওখানে গিয়েছিলাম। নতুন একটা পরিবর্তন দেখে এলাম। সেই শান্ত শিষ্ট সাদা সিধে মানুষগুলি কেমন যেন মারমুখো হয়ে উঠেছে। এটা নিয়ে ওঠা নিয়ে এখানে ওখানে প্রায়ই হাঙ্গামা বাঁধছে। নিজের চোখে একটা ঘটনা দেখেছিলাম। ওরা দল বেঁধে ব্রাহ্মণের বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিল।' (পরিচ্ছেদ ।। দুই)। এরূপ একাধিক ঘটনার অভিঘাতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সূচিত হয়েছে এক ধরনের অস্থিরতা। সামসময়িককালের রাষ্ট্রনীতি, তাদের দমন–পীড়ন–কূট-ষড়যন্ত্রজাল উন্মোচিত হয়েছে বরাহস্বামীর উচ্চারণে :

> আর্য জাতির যে সমস্ত মহামূল্য সম্পদ আছে, কৌটিল্যের রাজনীতি নিঃসন্দেহে তাদের

মধ্যে অন্যতম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দীর্ঘ দিন ধরে কৌটিল্যের নীতি অনুসরণ করে চলবার ফলেই কৈবর্তদের মধ্যে আমরা এই সাফল্য লাভ করতে পেরেছি। অবশ্য এই সাফল্যকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য আরও অনেক কিছু করবার প্রয়োজন আছে। এ কথা মিথ্যা নয়, বিদ্রোহের অগ্নি কণাগুলি ছাইয়ের তলায় এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে।

[পরিচ্ছেদ।।দুই]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ কৈবর্তদের জাতিক নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। নির্দিষ্ট মৃত্তিকা উৎসজাত এই জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহী জীবনচেতনার কার্যকারণও নিহিত রয়েছে তাদের সুগভীর আত্মবিশ্বাসদৃপ্ত উচ্চারণের মধ্যে : 'এই কট্টলি আমাদের সবার মা, তার মাটি থেকেই আমাদের জন্ম।' সত্যেন সেন লোককথা ও মিথ-উৎসের ব্যবহারে এই জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহী সত্তার সমগ্র রূপ অঙ্কন করেছেন। সময়ের বিবর্তনের পটভূমিতে কৈবর্ত সমাজের মধ্যেও রূপান্তর সাধিত হয়েছে : 'গৌড়ের লোকদের সংস্পর্শে আসবার ফলে তাদের মধ্যেও সভ্যতার কিঞ্চিৎ আলো এসে পড়েছে। আগেকার চেয়ে অনেকই বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে তারা, গৌড়ের লোকেরা এখন সে কথা স্বীকার করে।' (পরিচ্ছেদ ।। পাঁচ)। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়বোধের পাশাপাশি কৈবর্তরা অধিকার সচেতনও হয়ে উঠেছে। ডাকাত সর্দার পরভূর নেতৃত্বে যখন বহিরাগত বণিকদের ধান লুণ্ঠন করে গরীব কৈবর্তদের মধ্যে বন্টন করা হয়, সচেতন কৈবর্তরা তার ইতিবাচক দিকটিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই পরিস্থিতিতে শুরু হয় রাজ সৈন্যদের নির্মম অত্যাচার, নিপীড়ন। রাজার সঙ্গে বরেন্দ্রীর কৈবর্তদের দ্বন্দ্ব অবশেষে বিদ্রোহ ও সংগ্রামে রূপ নিলো। রাজ সৈন্যদের নির্মমতার একটি চিত্র :

--রাজার সৈন্যেরা শিকারী কুকুরের মত চারদিককার গ্রামগুলিতে শিকার খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগল। লুটতরাজ, মারপিট আর হত্যাকাণ্ড চলল অবাধে। পাথরের মত অসাড় হয়ে পড়ে রইল মানুষগুলি; মুখ ফুটে কথা বলবার মত শক্তিটুকুও কারু রইল না। রাজধানীতে সংবাদ পৌঁছল, অবস্থা আয়ত্তে এসেছে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আর এক জরুরী সংবাদ—বরেন্দ্রীর পূর্ব প্রান্তে নতুন গোলমাল দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে আরও সৈন্য পাঠাতে হবে। পদাতিক নয়, অশ্বারোহী সৈন্য। এইভাবে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার চক্র গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

[পরিচ্ছেদ।।চার]

সমাজ-ইতিহাসের স্বরূপ সন্ধানের অনুষঙ্গে সত্যেন সেন বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব, বিকাশ ও তার মৌল সত্যবিরোধী প্রবণতা সমূহের গতি-প্রকৃতি উন্মোচন করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি, ঐতিহাসিক তথ্যের সদ্ব্যবহার করেছেন অন্তরঙ্গভাবে। 'বৌদ্ধধর্ম এক সময় বর্ণাশ্রমবাদী আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রাকৃতজনের

অভীপ্সাকে ধারণ করেছিল, এবং তারই ফলে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূভাগ বৌদ্ধ প্লাবনে ভেসে যায়। কিন্তু ইতিহাসের সে কালপর্বে শ্রেণীসমাজের অবসান ঘটার মতো বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি, তাই বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়ে শ্রেণী বৈষম্যেরই পৃষ্ঠপোষকতায় নিরত হয়, এবং কৌটিল্যের উত্তরসূরী ব্রাহ্মণদের সহায়তায় শূদ্রপীড়নে বৌদ্ধ রাজারাও পশ্চাৎপদ থাকেন না। বাংলার বৌদ্ধ রাজা মহীপাল আর তাঁর ব্রাহ্মণ অমাত্য বরাহস্বামী অত্যাচারে নির্যাতনে শুধু শূদ্রদেরই বিদ্রোহী করে তোলেননি, রাজ্যের বৌদ্ধ ধর্ম-যাজকদেরও অসন্তুষ্ট করে তোলেন, রাজ পরিবারের অভ্যন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন।'[১৮] রাজশক্তির এই আভ্যন্তরণীন দ্বন্দ্বের ফলে বিদ্রোহী শূদ্রদের পক্ষে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়। শূদ্র সামন্ত প্রভু দিব্বোক কালক্রমে হয়ে ওঠেন 'শূদ্রদের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক।'

রাজ প্রাসাদের জটিল ক্ষমতাদ্বন্দ্ব ক্রমাগত তীব্রতর হয়ে ওঠে রাজমাতা শংখদেবী এবং রাজবৈদ্য হরিগুপ্তের নেতৃত্বে। পাল রাজারা বৌদ্ধ হবার ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে তাদের সংঘাত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অব্যাহত ছিলো। মহীপালের প্রধান অমাত্য বরাহস্বামী ব্রাহ্মণ। বিগ্রহ পালের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মহীপাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে শংখদেবী নিজ গর্ভজাত সন্তান রামপালকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। প্রধান অমাত্য ব্রাহ্মণ হওয়ায় স্বভাবতই পূর্ববর্তী রাজাদের সময়কার বৌদ্ধদের প্রতি আচরণকে রাজকীয় হাতিয়ারে পরিণত করার চেষ্টায় থাকেন শংখদেবী। এই পটভূমিতে বরেন্দ্র এলাকার কৈবর্তরা তাদের উৎপন্ন ফসল ধানের ওপর নতুন করে রাজকর নির্ধারণকে কেন্দ্র করে হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ। রাজপুরুষ ও সৈন্যদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা পরভূর নেতৃত্বে সংগঠিত হতে থাকে। গৌড় নির্বাচিত শূদ্র সামন্ত প্রভূ দিব্বোকের কাছে কৈবর্তরা তাদের অভাব অভিযোগ পেশ করতে থাকে। নিজ শ্রেণী অবস্থানগত দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও নিজ সম্প্রদায়ের আহবান অস্বীকার করতে পারেন না দিব্যোক। ফলে, বিদ্রোহী কৈবর্তদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি গণ-নায়কে পরিণত হন। দিব্যোকের বিচক্ষণ নেতৃত্ব শূদ্ররাজ প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তোলে।

বিদ্রোহী কৈবর্ত উপন্যাসের কাহিনী দু'টি ধারায় প্রবাহিত। গৌড় রাজ পরিবার ও তার পারিপার্শ্বিকতাকে আশ্রয় করে একটি শাখা পরিকল্পিত— যে ধারার সমাপ্তি রাজমাতা শংখদেবী ও রাজবৈদ্য হরিগুপ্তের প্রৌঢ় প্রণয় ও তার মর্মান্তিক পরিণামের মধ্য দিয়ে। উপন্যাস-কাহিনীর অন্য ধারা বরেন্দ্র এলাকার

কৈবর্তদের জীবন ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত। কৈবর্তরা গৌড় অধিকার করার পর কাহিনী অস্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়েছে। হরিগুপ্ত ও শংখদেবীর প্রেম সূচিত হয় বিদ্রোহের সময় তাদের পলায়নের মধ্য দিয়ে। পলাতক জীবনে তাদের প্রৌঢ় চৈতন্যে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। দুজনেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর সর্বত্যাগী আদর্শ গ্রহণ করে দেশত্যাগ করে। বহু তীর্থলোক পরিভ্রমণের পর এক নতুন রাষ্ট্রে উপনীত হয় তারা, যেখানে নৌকায় পাহাড়ী নদী অতিক্রম করার সময় ঝড়ে তাদের মৃত্যু ঘটে। কৈবর্ত কিশোর আকনের বিষাক্ত তীরের আঘাতে অসুস্থ হয়ে দিব্বোকের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। এ-সময় পরাজিত পালরাজারা দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণ করলেও কৈবর্তদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে তারা বিতাড়িত হয়। মৃত্যু পথযাত্রী দিব্বোক বিষাক্ত তীর নিক্ষেপকারী আকনের উদ্দেশে যে বাণী উচ্চারণ করে, তা সত্যেন সেনের জীবনার্থেরই প্রতিধ্বনি :

> দিব্বোক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। আকন, তুমি আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাই না?
>
> হ্যাঁ, উত্তর দিল আকন।
>
> তবে তার পরিবর্তে আমি তোমার জীবন চাই।
>
> আমার জীবন দিতে আমি প্রস্তুত আছি।
>
> বেশ ভাল কথা তোমার জীবন নিয়ে নিলাম আমি। তোমার জীবন এখন থেকে আর তোমার নয় আমার। আমার আদেশ রইল, এই জীবন তুমি দেশের কাজে বিলিয়ে দেবে।
>
> [পরিচ্ছেদ।। সতের]

ইতিহাস-অবলম্বী হলেও *বিদ্রোহী কৈবর্ত* উপন্যাসে ইতিহাসের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়নি। গৌড় রাজের সাথে কৈবর্তদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত রূপায়ণের প্রশ্নে সত্যেন সেন শোষণ-নিপীড়ন ও সংগ্রামের চিরায়ত কাঠামোকেই গ্রহণ করেছেন। মানুষের সমগ্র সংগ্রামের মূলে শ্রেণীচেতনার উপস্থিতি যে অনিবার্য, কৈবর্তদের জাগরণের রূপ ও স্বরূপ অঙ্কন করতে গিয়ে যে সত্যকে তিনি পরম বলে গ্রহণ করেছেন। জমির স্বত্বাধিকারের প্রশ্নে কৃষক কৈবর্তরা যখন উচ্চারণ করে : 'জমির আবার কর কি? এ নিয়ম কোনকালে ছিল না। চাষী আর জমি কি আলাদা? এ মাটির স্বত্ব নিয়েই আমরা জন্মাই।'-তখন তেভাগা আন্দোলনের 'লাঙল যার জমি তার' তত্ত্বের প্রতিধ্বনির মতোই মনে হয়।

ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ হিসেবে এ-উপন্যাসের সাফল্য একাধিক কারণে দ্বিধাগ্রস্ত। কৈবর্ত বিদ্রোহ এ-উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন সেন মানুষের ব্যক্তিজীবনের একাধিক মাত্রাকে ব্যবহার করেছেন — যা উপন্যাসের কাহিনী কাঠামোর সাথে অনিবার্য সূত্রে গ্রথিত নয়। শংখদেবী ও

হরিগুপ্তের পলায়ন রাজপরিবারের সমকালীন অবস্থার সাথে হয়তো বা সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু তাঁদের প্রৌঢ় প্রণয় উপন্যাসের বাহুল্য সংযোজন বলেই মনে হয়। এ-অর্থে, দিব্বোক ও উনছলির প্রাকৃত প্রেম শূদ্র জীবনের মৌল স্বভাবের অঙ্গীভূত— যা উপন্যাস-কাহিনীর অনিবার্য অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। বৌদ্ধদের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক সত্য হলেও, তার তত্ত্বালোচনার প্রলম্বন উপন্যাসের জৈবসমগ্রতার পরিপন্থী।

চার

সত্যেন সেনের *পুরুষমেধ* উপন্যাসের উপকরণ সুপ্রাচীন ভারতবর্ষীয় হলেও বিষয়-ভাবনায় তিনি আধুনিক প্রগতিবাদী জীবনচৈতন্যের মর্মমূল স্পর্শ করেছেন। বৈদিক যুগে ভারতে নরবলি দিয়ে যজ্ঞ করার এক জান্তব রীতির প্রচলন ছিলো। 'সেই যজ্ঞের নাম ছিল পুরুষমেধ। এখানে পুরষ অর্থ মানুষ, আর 'মেধ' মানে যজ্ঞ। অশ্ব বলি দিয়ে যে যজ্ঞ করা হত তার নাম অশ্বমেধ। তেমনি পুরুষ বলি দিয়ে যে যজ্ঞ করা হত তার নাম পুরুষমেধ। এই যজ্ঞে ১৮৪ জন পুরুষকে বলিদান করার বিধান ছিল। অবস্থা বিশেষে একজন পুরুষকে বলি দিয়েও মাংসলোভী দেবতার তৃপ্তি সাধন করা হত।'[১৯] পৌরাণিক জীবনসম্পর্কিত এই কাহিনী-উৎসকে সত্যেন সেন আধুনিক সভ্যতার বিচিত্র অপশক্তি তাড়িত মানবজীবনসঙ্কটের সমান্তরালে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এই বোধের প্রকাশ ঘটেছে 'অবতরণিকা' অংশে :

> ধর্মীয় অন্ধতা ও অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন সেই স্মরণাতীত যুগকে বহু পিছনে ফেলে আমরা সামনে এগিয়ে এসেছি। পুরুষমেধ একটা বর্বর প্রথা, এ কথা আমরা সবাই বলব। কিন্তু জ্ঞানে বিজ্ঞানে আলোকিত আধুনিক জগতের মানুষ আমরা— আমরা কি সেই বর্বরতা থেকে মুক্ত? বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য যুগে ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, জাতীয়তাবাদের নামে, শ্রেণী স্বার্থের নামে যে জগৎ জোড়া ব্যাপক পুরুষমেধ অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে— হিংস্রতা, বীভৎসতা ও অমানুষিকতার দিক দিয়ে তা কি প্রাক-সভ্যতা যুগের পুরুষমেধকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায় না? রক্তপিপাসু যুদ্ধদেবতার বেদীমূলে একটি নয়, দুটি নয়, লক্ষ লক্ষ নিরীহ আর অসহায় মানুষের বলিদান চলেছে। পুরুষমেধ উপন্যাস লিখতে লিখতে আমার মন আমার অজান্তে সেই সুদূর অতীতের ব্যবধানকে পেরিয়ে আধুনিক জগতের নির্বিবেক, নিষ্ঠুর ও বীভৎস পরিবেশের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।[২০]

বৈদিক সভ্যতার পটভূমি অবলম্বনে রচিত এ-উপন্যাসের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক কাহিনীভিত্তি না থাকলেও এর ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্রায়ণ, সর্বোপরি প্রতিপাদ্য ও প্রমাণের সঙ্গতি পৌরাণিক যুগসত্যকেই উপস্থাপন করে। উপন্যাস-

কাহিনী সেই সময়কালের, যখন আর্যরা সবেমাত্র ভারতবর্ষে আগমন করেছে, এবং যাযাবর জীবনের অস্থিরতা অতিক্রম করে কিছুটা সুস্থির জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই সময়কালে বেদ ছিলো প্রাধান ধর্মগ্রন্থ এবং জনজীবনে দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, পূজিত। ভারতবর্ষের পূর্বতন অনার্য জীবনধারা, তাদের সংস্কার, সংস্কৃতি, ধর্মাচার বৃহত্তর সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে তখনো পরিব্যাপ্ত, ক্রিয়াশীল।

পুরুষমেধ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা একটি কৃষক বিদ্রোহ। শূদ্র কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত 'বলি' তথা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে গোকর্ণ রাজ্যে প্রবল বিক্ষোভ সূচিত হয়। রাজার সুস্বাস্থ্যের জন্য দেবতার যজ্ঞে পুরুষমেধের আয়োজন উপলক্ষে শূদ্র সুদাসের শিশুপুত্র খেতুর অপহরণকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ পরিণত হয় বিদ্রোহে। এই ক্ষোভ ও দ্রোহ বিশৃঙ্খল করে দেয় সমগ্র রাজ্য, তার প্রশাসনযন্ত্র। এই ঘটনার সমান্তরালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য পুরোহিত ও রাণী সুদক্ষিণার সাথে মহাপাত্র বা প্রধানমন্ত্রীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতও বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসে।

উপন্যাসের সূচনায় সুদাসের হাহাকার ও পথসন্ধানের ব্যাকুলতা অনেকটা পৌরাণিক আবহের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত। প্রাচীন জনগোষ্ঠীর লোকায়ত জীবনপ্যাটার্ন, ধর্মসংস্কার, প্রথানির্ভর জীবনচর্যা, প্রকৃতির প্রতিকূলতায় প্রকৃতিদেবীরই আরাধনা প্রভৃতিকে সত্যেন সেন দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেন। কল্পনাশক্তির সীমাহীন স্বাধীনতা সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের জগৎ রোম্যান্স-আক্রান্ত নয়, অবলোকনের অনন্যতায় তাঁর উপন্যাসবিধৃত জগৎ ক্লাসিক শিল্পমহিমায় অভিষিক্ত। 'পথের দেবতা'র উদ্দেশে সুদাসের কাতর প্রার্থনায় পৌরাণিক আবহের সাথে ক্লাসিক জীবনদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে :

> ওগো পূষাণ, ওগো পথের দেবতা, আমাকে পথ দেখাও। কে জানে কোন অপদেবতার মায়ায় সারাদিন এই গহীন বনে ঘুরে ঘুরে মরছি। পূষাণ, তুমি সকল মায়াবীর শ্রেষ্ঠ মায়াবী, তোমার মায়ার সামনে কার মায়া দাঁড়াতে পারে! সূর্যের আলোর মত প্রখর তোমার ওই তীরের আঘাতে, যারা অন্ধকারের গোপন পথে চলাচল করে, তাদের মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক।
>
> হে পথিকের বন্ধু, পথিকের রক্ষক, উর্ধ্বে আকাশলোকে তোমার অধিষ্ঠান। এমন কোন পথ আছে যা তোমার দৃষ্টির বাইরে? আমাদের গরু আর মেষগুলি যখন তৃণভূমিতে চড়তে চড়তে পথ হারিয়ে বিপথে চলে যায়, তখন তুমিই তো তাদের পথ দেখিয়ে আন। আমি আজ পথ-হারানো পশুর মতই নিরূপায়, তুমি আমাকে পথ দেখাও, পথ দেখাও, ওগো দেবতা, পথ দেখাও।'[২১]

পথহারা সুদাসের এই কাতর প্রার্থনা কেবল পৌরাণিক জীবনাদর্শের স্বরূপই নির্দেশ করে না, উপন্যাসের মূল সঙ্কট ও সংগ্রামের সংকেত হয়ে ওঠে। আদি জীবন ও আদি বিশ্বাসের সমগ্রতায় প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর জীবনসত্য অভিব্যক্ত হয়েছে সুদাসের এ-পর্যায়ের কর্মধারায়। খরা ও দারিদ্র্যপীড়িত জনজীবনপরিক্রমা, ব্রতকথা, শূদ্রদের জন্ম রহস্য, টিকে থাকার মনস্তত্ত্ব এবং শূদ্র নারী চম্পীর মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হলো অধিকার সচেতন শূদ্র অন্তর্লোক। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ রাজপরিবারের ভোগ, স্থৌল্য ও নির্মম ধর্মানুগত্যের পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। বড় রাণী সুদক্ষিণাই প্রথম অমানবিক বলি প্রথার বিরুদ্ধে রাজা বৃষকেতুর নিকট প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক বর্বর আর্য রাজা বৃষকেতু সুদক্ষিণার শাস্ত্রসম্মত, বিচক্ষণ পরামর্শ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। রাজপুরোহিত উষস্তি চক্রায়ণ ঘোষণা দিলেন : 'যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপারে পত্নীদের অংশ গ্রহণের বিধান নাই। তাদের মৌখিক অনুমতিটুকুই প্রয়োজন। আর স্ত্রীজাতীয়াদের সংগে তনি কখনও শাস্ত্রালোচনা করেন না। শাস্ত্রালোচনা স্ত্রীজাতির অধিকার বহির্ভূত কাজ।' (পরিচ্ছেদ ।। চার)। উষস্তি চক্রায়ণের আচরণ-উচ্চারণে কেবল অপমানিতই বোধ করেন না সুদক্ষিণা, রাজতন্ত্রের ওপর পুরোহিততন্ত্রের অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর নিয়ন্ত্রণে তিনি হয়ে ওঠেন উদ্বিগ্ন। এর ভয়াবহ পরিণাম চিন্তায় তাঁর আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় :

> ইন্দ্রযজ্ঞের উপলক্ষ করে শূদ্র কৃষকদের বলির ভাগ স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি করে নেবার গোপন অভিসন্ধিটা রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকেরই জানা আছে। সেই পথ বেয়ে বেয়ে কথাটা সুদক্ষিণার কাছেও এসে পৌছেচে। এর মধ্য দিয়েই রাজ পুরোহিতের স্বরূপটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বুড়ো মন্ত্রী এবং আরও কিছু লোক আছে যারা মনে মনে এই বলি বৃদ্ধির ঘোর বিরোধী। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও তাদের মনে দাগ কেটে আছে। কাজেই শুধু মনে মনে নয়, মৃদু আপত্তিও এরা জানিয়েছিলেন, কিন্তু রাজ পুরোহিতের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা মাথা তুলতে পারেনি। মন্ত্রী প্রবীণ ও বিচক্ষণ লোক, তিনি জানেন রাজা আর তার পার্ষদদের উপর রাজ পুরোহিতের অসীম প্রভাব। সে ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিবাদের স্বরটা বেশী উঁচুতে তুলতে গেলে রাজার অসন্তোষের ভাজন হতে হবে এ আশংকা তাঁর মনে ছিল। সেই জন্যই একটু আপত্তি তুলেই অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে তিনি থেমে গেলেন। [পরিচ্ছেদ ।। চার]

এভাবেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে উপন্যাস কাহিনী। একাধিক শাখা কাহিনী ও অসংখ্য চরিত্রের কলরবে বৈদিক যুগের আর্য-অনার্যের জীবন বাস্তবতার অনেকটাই যেন রূপায়িত হয়েছে। বৈদিক যুগের সমাজকাঠামো কোনো নির্দিষ্ট রূপ ও রীতিবদ্ধ ছিলো না, অভিন্ন সময়ে বিচিত্র ধরনের সমাজ বিন্যাস বিদ্যমান ছিলো। 'তথাকথিত আর্য সভ্যতার সৌধ যে বিপুল সংখ্যক শূদ্র জনতার

লাঞ্ছনার উপরেই গঠিত,–সেই সুপরিচিত ঐতিহাসিক তথ্যটির জীবন্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে সত্যেন সেনের *পুরুষমেধ*–এ। মানবিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিতে শূদ্ররা যে মোটেই পশ্চাৎপদ ছিল না, বরং 'সভ্য' আর্য জাতিই যে সব রকমের অমানবিক কর্মকাণ্ডের হোতা, এবং তাদের সেই অমানবিকতাই শূদ্রদের মানবিকতাকে বিপর্যস্ত করে,–সমস্ত 'পুরুষমেধ' উপন্যাসটি জুড়ে তার নিপুণ বিশ্লেষণ–বিধৃত।'[২২] বৈদিক যুগের ভারতবর্ষে নব্য প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র যখন রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্রের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, তখনও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন সত্যেন সেন। সভ্যতা ও সমাজের অসমবিকাশের একাধিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে। দশম পরিচ্ছেদে চম্পাবতী রাজ্যের যে রূপ উন্মোচিত হয়েছে, সেখানে প্রাচীন ভারতের কৃষিভিত্তিক সমাজবিন্যাসেরই যেন বিন্যাস ঘটেছে। চম্পাবতী রাজ্যের আদি নাম 'আন্‌দ্‌রাপান্‌টি।' এই রাজ্যের শক্তিময়ী বিদূষী নারী অম্বথলার মাধ্যমে আর্য জাতির বর্বরতা ও দস্যুতার স্বরূপ যেমন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনি প্রাচীন ভারতের লোকায়ত জীবন ও দর্শনের ঐশ্বর্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যও বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। সত্যসন্ধানী আর্য পুরুষ সুদর্শন চম্পাবতীর সান্নিধ্যে যে জ্ঞান লাভ করে তার নিহিতার্থ আদিমতাস্পর্শী হলেও সর্বাধুনিক মানবীয় জীবনজিজ্ঞাসার সমধর্মী। স্বেচ্ছায় শ্রেণীত্যাগী, মানবকল্যাণকামী সাত্যকির জীবনসাধনা বেদোক্ত ইতিবাচক জীবনার্থের অনুসারী। প্রাক–আর্য অনার্যসভ্যতার ইতিবৃত্ত এবং যাযাবর লুণ্ঠনজীবী আর্যজাতির চরিত্ররূপ বিধৃত হয়েছে চম্পাবতীর কণ্ঠে। ভারতবর্ষে আর্য আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস করুণ ও মর্মবিদারক :

> শান্তির দেশ শান্তিতেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ একসময় ঈশান কোণ থেকে ঝড়ের মত দলে দলে নেমে এল দুরন্ত দস্যুর দল। ক্ষুধিত বৃকের মত পালের পর পাল ওরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। বৃক্কনরা কৃষি ও শিল্পজীবী শান্তিপ্রিয় জাতি। আর ওরা লুণ্ঠনজীবী দুর্ধর্ষ জাতি। ওরা বারবার আমদের উপর এসে ভেংগে পড়ত। আমাদের প্রাচীর ওদের ঠেকিয়ে রাখত। কিন্তু বেশী দিন পারল না। একদিন ওদের একটা দল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। সেই দিনই পতন হোল মহানগরীর। তরপর সে কি ধ্বংসের লীলা! ওই দুর্ধর্ষ বর্বরদের হাতে প্রাচীর গেল, অট্টালিকা গেল, নগরীর ধন–সম্পদ গেল— সব গেল। বর্বরেরা গড়তে পারে না কিছু, তাই ভাংগার উৎসাহ ওদের বেশী। প্রাচীর, অট্টালিকা, উদ্যান, স্নানাগার, সবকিছু ভেঙে চুরমার করল ওরা। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করল।
>
> [পরিচ্ছেদ ।। দশ]

ভারতবর্ষে অনার্য সভ্যতার অবক্ষয় ও আর্যসভ্যতার উদ্ভবের মর্মস্পর্শী ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন সত্যেন সেন। সুদর্শন যখন

বলে— 'ইন্দ্র দেবতা। দেবতাদের অসাধ্য কিছুই নাই।' তখন অশ্বথলার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় অনার্য লোকায়ত জীবনদর্শন— 'মানুষেরও অসাধ্য কিছুই নাই। সাধনার বলে সবকিছুই সম্ভব। এইটাই আমাদের শক্তিসাধনার গুহ্যতম তত্ত্ব।'

উপন্যাসের এগারো পরিচ্ছেদে সুদাস ও ইদার পুত্র খেতুর পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। অনার্য সমাজের নৃতাত্ত্বিক ধাঁচেই গড়া খেতুর অবয়ব। এই সূত্রে কৃষিজীবী সমাজে প্রথা, ব্রত–পার্বণের বিস্তৃত পরিচয় এবং শূদ্র সমাজের অস্তিত্বের সংকটও বিধৃত হয়েছে উপন্যাসে। বারো পরিচ্ছেদ থেকে রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পুরোহিত ঊষস্তি চক্রায়ণের ষড়যন্ত্রে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করে শ্রুতকীর্তিকে মন্ত্রীপদে বহাল, রাণী সুদক্ষিণার কর্ম-তৎপরতা, বিদেশ ভ্রমণ শেষে সুদর্শনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হয়েছে। রাজা বৃষকেতু অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজপুরোহিতের অশুভ চক্রান্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাণী সুদক্ষিণা শত চেষ্টা সত্ত্বেও রাজপুরোহিত ঊষস্তি চক্রায়ণ ও নতুন মন্ত্রী শ্রুতকীর্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। পুরোহিততন্ত্র এ–পর্যায়ে রাজতন্ত্রকে কতোটা নিয়ন্ত্রণ করছিলো, ঊষস্তি চক্রায়ণের উদ্দেশে সুদক্ষিণার ব্যঙ্গোক্তিই তার প্রমাণ : 'বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সমাজকে পথ দেখাবেন যাঁরা, তারা কি করছেন! অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শাস্ত্রচর্চা, যজন ও যাজনের সাত্ত্বিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে তাঁদের মন আর আটকে থাকতে চাইছে না। তাঁদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে সিংহাসনের দিকে।' (পরিচ্ছেদ।। পনেরো)। এর ফল হলো ভয়াবহ। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হলো রাণী সুদক্ষিণাকে। রাজার অবস্থার ক্রমাবনতির পরিপ্রেক্ষিতে পুরোহিত ঘোষণা দিলেন, 'বরুণ দেবকে প্রসন্ন করবার জন্য পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে হবে।' এবং সেই পুরুষমেধ যজ্ঞের বলি হিসেবে নির্বাচিত হলো সুদাস ও ইদার শিশুপুত্র খেতু। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শূদ্রদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জাগরণ সূচিত হয়— যার রূপ হিংস্র, রুদ্র, সর্ববিধ্বংসী :

> খেতু হারিয়ে যাবার তিন দিন বাদে খবর পাওয়া গেল, রাজার আরোগ্য কামনায় যে যজ্ঞ হয়েছে, তাতে নাকি ছোট্ট একটি কৃষ্ণকায় শিশুকে বলি দেওয়া হয়েছে। এবার আর কারু মনে কোন সন্দেহ রইল না। যজ্ঞের মধ্যে মানুষ বলি, এমন কথা কেউ কোনদিন শোনে নি। ওরা তো মানুষ নয়, ওরা রাক্ষস। ওরা সব কিছুই করতে পারে।
>
> খবর শুনে ইদা চীৎকার করে আছড়ে পড়ল। কিন্তু সুদাস একটুও কাঁদল না। সে চুপ করে শক্ত হয়ে বসে রইল, ইদার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না শুধু হিংস্র শ্বাপদের মত তার চোখ দুটো প্রতিহিংসার আগুনে ধক ধক করে জ্বলতে লাগল। শুধু সুদাস নয়, সমস্ত শূদ্রের চোখেই এই আগুনের শিখা দেখা দিল। খেতু এখন আর শুধু সুদাসের সন্তান নয়, তাদেরও সন্তান। তাকে হারিয়ে শুধু সুদাসই সন্তানহারা হয়নি, সমস্ত শূদ্রজাতি সন্তানহারা হয়েছে।

গ্রামের পর গ্রামে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যেখানেই শূদ্র আছে, সেখানেই এই সংবাদ গিয়ে প্রবেশ করল। আর সংবাদ যেখানেই প্রবেশ করল, সেখানেই আগুন জ্বলে উঠল।

[পরিচ্ছেদ। সতেরো]।

উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দ্রুততার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। শূদ্রদের প্রতিশোধের হিংস্র থাবা গোকর্ণ রাজ্যের অন্তর-বাহিরকে ধ্বংস ও রক্তের ভয়াবহতায় করলো বিপর্যস্ত। সুদক্ষিণা অন্ধপ্রকোষ্ঠ থেকে বিষাক্ত ছুরি হাতে বেরিয়ে এসে আঘাত করলেন রাজ পুরোহিতকে। আহত মরণোন্মুখ রাজপুরোহিতের ছুরিকাঘাতে সুদক্ষিণারও মৃত্যু হলো। শূদ্রদের মধ্যে আর্য বিরোধী যে হিংস্রতার বিস্তার ঘটে, তার সর্বশেষ বলি তাদেরই কল্যাণকামী, শ্রেণীত্যাগী সাত্যকি এবং প্রেমময়ী উলুপী।

প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশেষ যুগসত্যের রূপায়ণে সত্যেন সেনের প্রগতিবাদী জীবনচেতনার বিন্যাস *পুরুষমেধ* উপন্যাসে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে। কল্পিত চরিত্রসমূহকে তিনি ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনুষঙ্গী করে নির্মাণ করেছেন এবং এই সকল চরিত্রের আচার-আচরণ উচ্চারণ মানুষের চিরায়ত স্বভাবধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ-উপন্যাসে 'শ্রেণী সংগ্রামের আধুনিক যুগসত্য ব্যক্ত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এতে শূদ্র শিশু খেতুর বলির পর যুগ যুগান্তের শোষিত ও নির্যাতিত শূদ্রদের মধ্যে জাগরণ এবং রাজা বৃষকেতু ও প্রভু শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভের কাহিনী সার্থকভাবে চিত্রিত। ধর্মান্ধতা ও শাস্ত্রানুগত্যের মানবতাবিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে মানুষের সর্বকালের বিদ্রোহই এ উপন্যাসের মর্মবস্তু। ...মানব সভ্যতার সার্বজনীন সত্য জীবনের বহুমুখী দ্বন্দ্বই এ-উপন্যাসে বিধৃত।'[২৩] সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিচিত রূপ দক্ষতার সাথে বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসে। ঐতিহাসিক কালের বিরাট পরিসরকে অনেকটা নাটকীয় পরিচর্যায় উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। একাধিক শাখা কাহিনীর বিন্যাস সত্ত্বেও তা কখনো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। বরং জীবনসত্যের অন্বিষ্ট রূপের সমগ্রতাই এর ফলে অভিব্যক্ত হয়েছে। কখনো কখনো তত্ত্বলোচনার প্রয়োগ ঘটলেও তা উপন্যাসের পট ও পটবিধৃত জীবনকে করে তোলেনি ভারাক্রান্ত, তত্ত্বজীর্ণ।

পাঁচ

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বৌদ্ধ ভারতের পটভূমি অবলম্বনে রচিত হয়েছে সত্যেন

সেনের *কুমারজীব* উপন্যাস। চরিত্র প্রধান উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিচয় ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যঞ্জনাধর্মী বর্ণনা উপন্যাসকে দান করেছে অন্যতর মাত্রা। ধর্মতত্ত্বের আধিপত্য সত্ত্বেও কুমারায়ণ ও কুমারজীবের জীবনকথায় আমরা স্পর্শ করতে পারি একটা কালের জীবনপ্যাটার্নের অন্তর-বাহিরের বিচিত্র রূপ। ঔপন্যাসিকের ইতিহাস-অনুসন্ধানস্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের ভূমিকাংশে। লিপিবদ্ধ ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা যে-কোনো সচেতন শিল্পির মতো সত্যেন সেনকেও পীড়িত করেছে। যে-কারণে, তিনি অধীত জ্ঞান ও মানবমুখী জীবনজিজ্ঞাসায় সন্ধান করেছেন মানুষের সত্য-ইতিহাস। শিল্পির মনোভূমির বিজ্ঞাননিষ্ঠাই ইতিহাসের সত্যরূপ আবিষ্কারের সমর্থ হয়। এই বহুবিস্তৃত শিল্পজিজ্ঞাসার পরিচয় সত্যেন সেনের উচ্চারণের মধ্যেই সুস্পষ্ট :

> মধ্য এশিয়ার সেই ব্যাপক অঞ্চল এই উপন্যাসের রংগভূমি, এককালে তা সভ্যতার আলোকে প্রদীপ্ত ও সমুজ্জ্বল ছিল। ভারতবর্ষ থেকে চীনে যাবার দুটি পথ, যার এ-পাশে ওপাশে কতগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ছিল অপ্রতিহত প্রভাব, ভাষার দিক দিয়েও এরা ছিল সংস্কৃতভাষী। সেই কারণে ভারতবর্ষ থেকে বাইরে হলেও এরা ভারতীয়দের সংগে আত্মিক বন্ধন অনুভব করত। এই সমস্ত রাজ্যের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বিহার পরিচালিত হত। সেই সকল বিহারে হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু শাস্ত্রচর্চা করতেন। –
>
> এই উপন্যাসকে আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেই দাবী করতে চাই। পাঠকদের মনে স্বাভাবিকভাবে এই কৌতূহল জাগতে পারে যে, এর ঐতিহাসিক কাঠামোটা আমি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছি। এ কথা সত্য, প্রচলিত ইতিহাসের পাতায় এই কাহিনীটিকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে লোক চক্ষের আড়ালে মাটির তলায় চাপা পড়ে ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাকে সেই বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[২৪]

ইতিহাসের আবহ রক্ষিত হলেও ব্যক্তির জীবনপরিক্রমার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ এ-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। কুমারজীব চরিত্র যে সত্যেন সেনের ইতিহাস-অনুসন্ধানেরই ফল, তা সন্দেহাতীত : 'কুমারজীব যে একজন বৌদ্ধ শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ নাই। তিনি তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ কার্যে আতিবাহিত করেন। চীন দেশের সাহিত্য কুমারজীবের স্মৃতি বহন করে আছে।' কিন্তু কুমারজীবের পিতা কুমারায়ণের জীবন ও পরিণাম বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের জীবনাদর্শের সাথে অনেকাংশে সঙ্গতিহীন।

এক 'দুর্গম পথের নিঃসঙ্গ যাত্রী' কুমারায়ণ। উপন্যাসের সূচনায় চলমানতার

ফ্রেমে বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারায়ণের উপস্থিতি :

> মাথার উপরে— অনেক উপরে, নীল আকাশের বুকে একটি পাখি উড়ে যাচ্ছে। উড়ে নয়, যেন ভেসে চলেছে। এত বড় একটা আকাশ, তার মধ্যে একটি মাত্র পাখি, আর কোন পাখি নেই। একা— একেবারেই একা। কুমারায়ণ নিঃসীম আকাশের পটভূমিতে সেই চলমান ছবিটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকালেন। আর ভাবলেন, উপরে আর নীচে আমরা দুজনেই একা। কিন্তু ঐ পাখিটি তো আর সত্যসত্যই একা নয়। যখন ওর সময় হবে, যখন ওর সাধ হবে, ওর নিঃসঙ্গ বিহার ছেড়ে নেমে আসবে নীচে। সেখানে ঘনপত্র পাদপের অন্তরালে সাথীদের সংগে মিলিত হয়ে কলকালিতে উচ্চকিত করে তুলবে বনভূমি। ওর মত কুমারায়ণেরও আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব সবই ছিল, আজও আছে। কিন্তু থেকেও আজ তারা নেই। বৌদ্ধ ভিক্ষু যে গৃহ ত্যাগ করে চলে আসে, সেখানে আর ফিরে যায় না।
>
> [পরিচ্ছেদ।। এক]

একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনজিজ্ঞাসায় উপর্যুক্ত উপলব্ধির উপস্থিতি অসঙ্গত মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে, উপন্যাসের পরিণামের সাথে কুমারায়ণের অনুভব অন্তঃসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে।

শ্রীনিধি রাজ্যের ব্রাহ্মণকূলে অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন কুমারায়ণ। কৈশোরেই স্বদেশের বিদ্যাপাঠ সমাপ্ত হলে বেদ-বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য তাঁকে পাঠানো হয় গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুরে। কয়েক বছরেই 'সর্বশাস্ত্রপারংগম' হয়ে তরুণ কুমারায়ণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বেদজ্ঞ কুমারায়ণ বেদের কর্মকাণ্ডে অনাস্থা প্রকাশ করেন। এবং গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মকে সংসারে যত ধর্ম আছে তার মধ্যে মহত্তম বলে ঘোষণা করেন। ফলে, শ্রীনিধি রাজ্যের রাজগুরুর পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি নিজেই দেশত্যাগ করে গান্ধার রাজ্যে চলে যান। সেখানে আচার্য ভদ্রাসনের কাছে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষু বেশে প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে পড়েন। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিচিত্র দেশ পরিভ্রমণের পর কুমারায়ণ কুচীরাজ্যে উপনীত হন। সেখানে তাকে গ্রহণ করতে হয় রাজ পুরোহিতের দায়িত্ব। রাজকুমারী জীবা 'ভিক্ষুর শান্ত সংযত রক্তধারায়' অন্যতর আলোড়ন সৃষ্টি করে। দীর্ঘ আত্মসংযম ও আত্মবিশ্লেষণের পর রাজকুমারী জীবাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। 'রাজপুরোহিত ভবনে রাজকুমারী জীবার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন কুমারায়ণ। সেই কুমারায়ণই এখন নিজে রাজকুমারীর হাতে ধরে তাকে নিয়ে সেই ভবনে এসে প্রবেশ করলেন।' (পরিচ্ছেদ ।। সাত)। বিবাহের দুই বছর পর তাঁদের প্রথম সন্তান ছেলের জন্ম হয়। 'বাবা আর মায়ের নাম মিলিয়ে তার নামকরণ করা হোল "কুমারজীব।" [পরিচ্ছেদ।। আট] 'এর তিন বছর পর তাঁদের

দ্বিতীয় সন্তান হংসকেতনের জন্ম হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ব্রতভ্রষ্ট কুমারায়ণের মধ্যে স্বভাবজাত বৈরাগ্যবৃত্তির পুনরুজ্জীবন ঘটে। এক জ্যোৎস্নাস্নাত গভীর রাতে তিনি গৃহত্যাগী হন— যেমন করে সিদ্ধার্থ ত্যাগ করেছিলেন সুন্দরী স্ত্রী যশোধরা ও পুত্র রাহুলকে। কুমারায়ণের গৃহত্যাগের মুহূর্তটি বেদনাকরুণ ও ব্যঞ্জনাময় :

> কুমারায়ণ সংকল্প স্থির করে আবার কক্ষের মধ্যে এসে ঢুকলেন। গবাক্ষপথে শয্যার উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় দেখা গেল আলুলায়িত বেশে ঘুমিয়ে আছে জীবা। তার একদিকে তিন বছরের কুমারজীব, আর একদিকে নবজাত হংসকেতন। ঘুমের মধ্যে জীবার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে, হয়তো কোন সুখের স্বপ্ন দেখছে। কুমারজীব এক হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। একটি শাখার দুইট বৃন্তে দুটি ফুল। বুকের ভিতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল, তাঁর রক্তের রক্ত, প্রাণের প্রাণ, এদের ফেলে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে! নির্বাণকামী সিদ্ধার্থকেও একদিন এমনি করেই অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে হয়েছিল। কুমারায়ণ মনে মনে প্রার্থনা করলেন, ভগবান বুদ্ধ, তুমি আমায় শক্তিদাও।
>
> [পরিচ্ছেদ। আট]

কুমারায়ণ গৃহত্যাগ করে চলে যাবার পর জীবা রাজপ্রাসাদ পরিহার করে ভিক্ষুনীদের বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুমারজীবের শিক্ষা কার্যক্রম কুচীরাজ্যে সম্ভব নয় বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বন্ধু দত্তের কাছে কুমারজীবকে অর্পণ করে জীবা স্বামীর স্বদেশ শ্রীনিধিতে গমন করেন। চৌদ্দ বছরে জ্ঞানসাধনা সমাপ্ত হয় কুমারজীবের। কুমারজীব জীবা আর চারুব্রত কুচীরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ-সময়ে বৌদ্ধ ধর্মে তত্ত্ব ও সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিলো। মহাযানপন্থী ও সর্বাস্তিবাদীদের মধ্যে বিরোধের পটভূমিতে পণ্ডিত কুমারজীব মহাযানবাদের প্রতিষ্ঠায় গৌরবময় অবদান রাখেন। বিভিন্ন রাজ্যে তিনি মহাযানবাদের বিজয় সূচিত করতে সমর্থ হন নিজ পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে। কুচীরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর সেখানকার রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির হয়ে ওঠে। চারু দত্তকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। কুমারজীবও চীনদেশে গমন করেন। সেখানে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্রগামী হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শেষে পিকিং-এ মা জীবার সাথে কুমারজীবের দেখা হয়। জীবা তাঁকে কুচীরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানালেও কুমারজীবের কাছে তা আর আকর্ষণীয় মনে হয় না। কেননা, তখন তাঁর দেশ ভৌগোলিক সীমাহীন। তাঁর জীবন ও অস্তিত্ব তখন ধর্মের মধ্যেই চৈতন্যময় রূপ লাভ করেছে।

উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদের পর কুমারায়ণ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত। সুতরাং চরিত্রায়ণের প্রশ্নে এটা নিঃসন্দেহে উপন্যাসের মারাত্মক অসঙ্গতি। ধর্মতত্ত্বের

জটিল বিশ্লেষণ, বিশাল ভৌগোলিক পরিসর, ধর্মের দেশত্যাগী অভিযাত্রিক রূপ ঔপন্যাসিক উপকরণ হিসেবে আকর্ষণীয় হলেও সত্যেন সেনের জীবনার্থের কোনো মীমাংসিত প্রতিধ্বনি *কুমারজীব* উপন্যাসে অনুপস্থিত। এ-উপন্যাসের জীবা ও চারুব্রত প্রসঙ্গ *বিদ্রোহী কৈবর্ত*-এর শংখদেবী ও হরিগুপ্ত আখ্যানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। *কুমারজীব*-এর শিল্প অসঙ্গতির মূল কারণ প্লটবিন্যাসে সময় শৃঙ্খলার অভাব। সত্যেন সেনের বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টি রোম্যান্সের স্পর্শে এ-উপন্যাসে অনেকটা বিপর্যস্ত। তবে ভূগোল ও জীবনবৈচিত্র্য আবিষ্কারে ঔপন্যাসিকের জীবনকল্পনার বিস্তার তাঁর শিল্পশক্তির অসাধারণত্বের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। 'নানা মতবাদের সংঘাত ও বিতর্ক *কুমারজীব*-এর মুখ্য উপজীব্য হলেও এতে পাঠকের সামনে মধ্য এশিয়ার এক ব্যাপক অঞ্চলের চমকপ্রদ চলচ্চিত্রমালার উন্মোচন ঘটেছে। উপন্যাস নামক শিল্প প্রকরণটির মধ্য দিয়ে ইতিহাসচেতনার বিস্তারের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ভূগোলকেও দূরবিস্তৃত করে দেয়ার যে-সাধনায় সত্যেন সেন ব্রতী হয়েছিলেন,-*কুমারজীব* ও সে সাধনার সাক্ষ্যবহ।'[২৫]

ছয়

সত্যেন সেনের জীবনবোধের সর্বজনীনতার প্রমাণ তাঁর *আলবেরুনী* উপন্যাস। দ্বাদশ শতাব্দীর কীর্তিমান মুসলিম গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের জীবন ও সংগ্রাম এ-উপন্যাসের উপজীব্য। এম. আকবর আলীর *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান* গ্রন্থ থেকে এ-উপন্যাসের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। আধুনিক ইরানের খারিজম শহরে জন্মগ্রহণকারী এ জ্ঞানতাপস ছিলেন বহু ভাষায় বিশেষজ্ঞ। আরবী, ফার্সী, গ্রীক, হিব্রু, অরামীয় ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান চিলো অগাধ। বিশ্বনাগরিক সুলভ মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী আল বেরুনী মুক্ত বুদ্ধির চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মের গণ্ডী তাঁর স্বাধীন জ্ঞানচর্চাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারেনি। আল বেরুনীর জীবনোপকরণের ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে সত্যেন সেন বাস্তবসম্মত কল্পনাশক্তির প্রয়োগে এ-উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর উক্তি স্মরণীয় :

> আলবেরুনী ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর চরিত্র ও ঘটনাবলীর মধ্যে অনেক কিছুই কল্পনাপ্রসূত। তবে আল বেরুনীর জীবনের ঐতিহাসিক কাঠামো ও পটভূমিকাকে আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব, সঠিকভাবে অংকন করতে চেষ্টা করেছি। অনেক ভুল-ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসাধক আবু রায়হান আল বেরুনীর দেশ, জাতীয়তা ও ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত অদম্য জ্ঞান-পিপাসার কিছুটাও যদি ফুটিয়ে তুলতে পেরে থাকি, তাহলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।'[২৬]

আলবেরুনী সত্যেন সেনের কারাজীবনের রচনা। তথ্যের ক্ষীণ সূত্রের সাথে কল্পনাশক্তির সমন্বয়ে এ-উপন্যাস রচিত হলেও আলবেরুনীর তপস্যাশুদ্ধ ও সংগ্রামশীল জীবনের অন্তর-বাহির এতে উপস্থাপিত। আলবেরুনী চরিত্রের মানবিক সত্যস্বরূপ উন্মোচনের প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক অসংখ্য কাল্পনিক পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টি করেছেন। একজন গ্রন্থপিপাসু জ্ঞানসাধক হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক ন্যায়-অন্যায় প্রশ্নে তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। সুলতান কাবুসের জুরজান, মামুনের খারিজম এবং সুলতান মাহমুদের গজনী-র পটভূমিতে আল বেরুনীর জীবন ও জ্ঞানসাধনার জগৎ বিস্তৃত। জ্ঞানপিপাসার ঐকান্তিকতায় জন্মভূমি খারিজম ত্যাগ করে তিনি জুরজানে সুলতান কাবুসের দরবারে উপনীত হন। বিদ্যানুরাগী, জ্ঞানসাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুলতান কাবুস তাঁকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। সুলতানের সাহচর্য ও প্রেরণায় আলবেরুনীর বিজ্ঞানসাধনার এক পর্যায়ে দুজন আলেম তাঁর গবেষণার উপকরণ চুরি করে। রাজা রুষ্ট হয়ে তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলে আলবেরুনী মর্মাহত হন। রাজজীবন ও আনুষঙ্গিক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর জ্ঞানসাধনার অনুকূল মনে না-হওয়ায় বেদনাহত চিত্তে জুরজান ত্যাগ করেন তিনি। খারিজমের সুলতান মামুনের রাজ দরবারও তার সংকীর্ণতা ও অজ্ঞানতার ফলে আলবেরুনীর কাছে আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে। এ-সময়ে গজনীর মহা পরাক্রমশালী সুলতান মাহমুদ খারিজমের সুলতানের কাছে এক পত্র প্রেরণ করেন :

> আমি শুনেছি, খারিজমের শাহের দরবারে নানা বিষয়ে পারদর্শী অভিজ্ঞ নিজ নিজ বিষয়ে অদ্বিতীয় জ্ঞানসম্পন্ন আবু রায়হান আলবেরুনী, ইবনে সিনা, আবু নসর, আবু সহল মসীহি ও আবুল হাসান নামক আলেমগণ আছেন। আপনি তাঁদের আমার এখানে অবশ্যই পাঠিয়ে দেবেন, যাতে তাঁরা আমার দরবারের গৌরব বর্ধন করতে পারেন এবং নিজেরাও অশেষ সম্মানের অধিকারী হতে পারেন।
>
> [পরিচ্ছেদ।।সাত]

পত্রের অন্তর্নিহিত রূঢ়তা আলবেরুনীকে স্তম্ভিত করে দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও খারিজম রাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভেবে আলবেরুনী অন্যান্য পণ্ডিতদের সাথে গজনীতে গমন করেন। কিন্তু গজনীতে এসে তাঁর মানববাদী জীবনাদর্শ প্রবল সংঘাতের মুখোমুখি হয়। হিন্দ জয়ের পর গজনীতে যে হাজার হাজার দাস-দাসী নিয়ে আসা হয়, তাদের মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ের দুর্দশা তাঁকে পীড়িত করে। অত্যাচার-নিপীড়ন সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে ওঠে তাঁর চিত্তলোক। যুগের স্বাভাবিকতা হিসেবে দাস-দাসীত্বের তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে আত্মজিজ্ঞাসার আপাতঃ সমাধান সন্ধান করেন আলবেরুনী। বন্ধু আহমদের মেয়ের

প্রতি বাৎসল্য তাঁর সংবেদনশীল চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। বিবাহের পর স্বামী কর্তৃক রায়হানার ওপর নির্মম মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন পিতৃহীনা রায়হানার প্রতি করুণার্দ্র করে তোলে আলবেরুন্নীকে। আমৃত্যু তিনি কঠিন জ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহিত করেন।

সত্যেন সেন আলবেরুন্নীর জীবনের যে রূপ ও স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, ইতিহাসবিধৃত চরিত্রের সাথে তার দূরত্ব সুস্পষ্ট। 'আল বেরুন্নীর জীবনের এমন একটি বাস্তব ঐতিহাসিক পটভূমি রয়ে গেছে যে, সে পটভূমিকে উপেক্ষা করে কল্পনার অবাধ বিস্তার ঘটানো কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। অথচ সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতার কোনো ব্যত্যয় না ঘটিয়েও আপন কল্পনার যথাযথ স্ফূর্তি ঘটানোর মধ্যেই সত্যেন সেন তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।' রাজদরবারের সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা, বর্বরতা তাঁর সংবেদনশীল মনকে কখনো কখনো রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করেছে :

> সেদিন রাত্রিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না। সেই চাবুকের বারি খেয়ে ছুটে চলা বন্দীদের দৃশ্যটা তাঁর চোখের সামনে যেন ভাসছিল। কিন্তু সেই দৃশ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ, তাঁর মনকে বিশেষভাবে দখল করে নিয়েছিল। এই তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বন্দীদের তিনি একটা সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলেন।
>
> [পরিচ্ছেদ।।আট]

সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হিন্দ ভ্রমণসূত্রে আলবেরুন্নীর জ্ঞানের বহুবিস্তৃত রূপ উন্মোচিত হয়েছে। আলবেরুন্নীর ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী জীবনদৃষ্টি তাঁর লাওয়াহোর–এ জীবনযাপন সূত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'অনেক অভিজ্ঞতায় পোড় খেয়ে ছোটখাটো আপোসের মধ্যে ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা খুঁজলেও সত্যেন সেনের আল বেরুন্নী প্লেটো এ্যারিস্টটলের মতো এস্টাব্লিশমেন্টের স্বার্থরক্ষক দার্শনিক চরিত্র নয়। ধর্মান্ধতাপূর্ণ মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানসাধক রূপে আলবেরুন্নীর উজ্জ্বল উপস্থিতি।'[২৭] চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে বর্ণনাধর্মিতার প্রাধান্য এ–উপন্যাসের শিল্পকৌশলের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। আলবেরুন্নীর ব্যক্তিস্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে সামসময়িক ইতিহাসের বিবিধ মাত্রাকে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। সমকালীন মুসলমান শাসকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ইঙ্গিতও এই সূত্রে প্রদান করেছেন সত্যেন সেন। তবে ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের মানবমুখিতা *আলবেরুন্নী* উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা ইতিবাচক প্রান্ত।

ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ হিসেবে 'অপরাজেয়' সত্যেন সেনের দুর্বলতম সৃষ্টি।

উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে ঔপন্যাসিকের মুক্তিকামী জীবনজিজ্ঞাসার ভূমিকাই মুখ্য। দিল্লীর মোঘল বংশের শেষ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ফিরোজ শাহ এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বর্ণনার অতিবিস্তার ও ঐতিহাসিক তথ্যের অসংলগ্ন প্রয়োগ এ-উপন্যাসকে অসফল সৃষ্টিকর্মে পরিণত করেছে।

সাত

প্রগতিশীল, সময়, সমাজ ও রাজনীতিসচেতন বিশ্বদৃষ্টি সত্যেন সেনের জীবনজিজ্ঞাসার কেন্দ্রীয় প্রেরণা। উপন্যাসের উপকরণ সন্ধানের প্রশ্নেও তিনি বিচিত্র পটভূমির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সমাজ ও রাজনীতি-অন্বেষার ক্ষেত্রে তাঁর যে স্বদেশ-বিহার লক্ষ্য করা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহে তা অধিকতর প্রাগ্রসর জীবনচেতনার সাক্ষ্যবাহী। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ইতিহাসের বিশ্বজনীন সত্যসন্ধানের প্রেরণা-উৎসে পরিণত হয়েছিলো। 'বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক সত্যেন সেন তাঁর কয়েকটি ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস সমকালীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভাবধারার ভিত্তিতেই রচনা করেন। স্বদেশ ও বিশ্ব-ইতিহাসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাঁর এসব উপন্যাসে সমকালীন জাতীয় আন্তর্জাতিক জীবনসত্য প্রকাশের লক্ষ্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।'[২৮] ষাটের দশকের বন্দীসময় ও সমাজচেতনাপ্রবাহের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিশ্ব-ইতিহাসলোকে বিহার করেছেন সত্যেন সেন। ধর্মশোষণ, জাতি শোষণ ও শ্রেণীশোষণে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত জাতিসত্তার অঙ্গীকার উল্লিখিত উপন্যাসমূহের বিষয়ভাবনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। শোষণের এই বিচিত্র রূপ ও তা থেকে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত বিশ্বমানবের জাগরণই অধিকাংশ উপন্যাসের মীমাংসিত প্রান্ত।

তথ্যনির্দেশ

১ Georg Lukacs, *The Historical Novel*, Translated from the German by Hannah and Stanley Mitchell (1963, Boston) p. 19

২ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা) পৃ. ২২

৩ Georg Lukacs, Ibid, Pp. 60-61

৪ রণেশ দাশগুপ্ত, 'বিপ্লবী নয়া ধ্রুপদী গণ-কথাশিল্পী সত্যেন সেন', *আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ* (১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা), পৃ. ১৯৬-৯৭

৫ History is not an objective empirical datum; it is a myth. Myth is no fiction but a reality; it is however, one of a different order from that of the so called objective empirical fact. Myth is the story preserved in popular memory of a past event and transcends the limits of the external objective world, revealing an ideal world, a subject-object world of facts.'—Nicolas Berdyaev, Myth as Memory, *The Modern Tradition*, Edited by Richard Ellmann and Charles Feidelson (1977, New York, Oxford University Press) p. 670

৬ সন্তোষ গুপ্ত-কৃত 'মুখবন্ধ', অভিশপ্ত নগরী, (১৯৭১, স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, মুক্তধারা, কলিকাতা,)

৭ 'The importance of God or hero in the myth lies in the fact that such Characters, who are conceived in human likeness and yet have more power over nature, gradully build up the vision of an omnipotent personal Community beyond an indifferent nature. It is this Community which the hero regularly enters in this apotheosis.— Northorp Frye, 'The Archetypes of Literature,' *Tweentieth Century Criticism*, Ed. by William J. Handy and Max Westbrook (1974, New Delhi), P. 242

৮ যতীন সরকার, 'সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস', *গণসাহিত্য*, সম্পাদক : আবুল হাসনাত, (অষ্টম বর্ষ।। চতুর্থ-ষষ্ঠ সংখ্যা।। চৈত্র ১৩৮৬, ঢাকা), পৃ. ৩৯

৯ সত্যেন সেন, *অভিশপ্ত নগরী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১০ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, (১৯৮৭, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা), পৃ. ৯৭

১১ সত্যেন সেন, *পাপের সন্তান* (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৪, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা), শিরোনামাহীন ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১২ যতীন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১৩ সত্যেন সেন, *পাপের সন্তান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১৪ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

১৫ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেরশর উপন্যাস : আঙ্গিক-বিবেচনা', *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস*, সম্পাদনা : অরুণ সান্যাল (১৯৯১, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা)

১৬ যতীন সরকার , পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১

১৭ সত্যেন্ সেন, *বিদ্রোহী কৈবর্ত,* (১৩৮৬, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা), প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২–৩

১৮ যতীন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১৯ সত্যেন সেন, *পুরুষমেধ,* (১৯৬৯, সুচয়নী, ঢাকা), 'অবতরনিকা' অংশ দ্রষ্টব্য

২০ পূর্বোক্ত

২১ *পুরুষমেধ,* পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ।। এক, পৃ. ১

২২ যতীন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

২৩ মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, *আমাদের উপন্যাসে বিষয়চেতনা : বিভাগোত্তর কাল* (১৯৮৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা), পৃ. ১৪৯

২৪ সত্যেন সেন, *কুমারজীব,* (১৯৭৬, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা), শিরোনামহীন ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

২৫ যতীন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

২৬ সত্যেন সেন, *আলবেরুনী* (১৩৭৬, প্রকাশভবন, ঢাকা), 'এই উপন্যাস প্রসংগে' দ্রষ্টব্য

২৭ যতীন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

২৮ মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪